পঞ্চগড় জেলার হুলি গানের পরিবেশনা শৈলী

The Performance Style of Huli Songs in Panchagarh District

গবেষক

মোঃ রবিউল হক
রেজি. নং - ১৫৬
শিক্ষাবর্ষ: ২০১৮-২০১৯ ইং
সংগীত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

তত্ত্বাবধায়ক

ড. শাহনাজ নাসরীন ইলা
অধ্যাপক
সংগীত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.ফিল. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

মে ২০২২

Dhaka University Institutional Repository

অঙ্গীকারনামা

আমি এই মর্মে অঙ্গীকার করিতেছি যে, 'পঞ্চগড় জেলার হুলি গানের পরিবেশনা শৈলী' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার মৌলিক রচনা। ক্ষেত্রসমীক্ষার ভিত্তিতে আমি এটি রচনা করেছি। এই অভিসন্দর্ভের কোন অংশবিশেষ কোথাও প্রকাশিত হয়নি কিংবা প্রকাশের জন্য জমা দেওয়া হয়নি।

মোঃ রবিউল হক
এম.ফিল. রেজিঃ নং : ১৫৬
শিক্ষা বর্ষ : ২০১৮-২০১৯
সংগীত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, মোঃ রবিউল হক কর্তৃক উপস্থাপিত 'পঞ্চগড় জেলার হুলি গানের পরিবেশনা শৈলী' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে তার এমফিল কোর্সের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ১৫৬, শিক্ষাবর্ষ ২০১৮-২০১৯। এটি গবেষকের মৌলিক গবেষণাকর্ম। এই অভিসন্দর্ভ বা এর কোন অংশ গবেষক অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান বা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থাপন করেননি।

ড. শাহনাজ নাসরীন ইলা
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
অধ্যাপক, সংগীত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

সার-সংক্ষেপ

জাতি হিসেবে বাঙালিরা সংস্কৃতিপ্রেমী একথা অনস্বীকার্য। বাংলাদেশ লোকসংস্কৃতির নানা উপাদানে সমৃদ্ধ ও পরিপূর্ণ। লোকসংস্কৃতি বলতে সাধারণত গ্রামীণ সংস্কৃতিকেই বুঝানো হয়ে থাকে। ‘লোকসংস্কৃতি’ বা সাংস্কৃতিক লোকজ উপাদান বোঝাতেই Folklore শব্দের প্রথম অবতারণা করেন ব্রিটিশ লোকবিজ্ঞানী উইলিয়াম থমসন ১৮৪৬ সালে। যদিও লোকসংস্কৃতির পূর্ণ অর্থ প্রকাশে Folklore শব্দটি কতোটা যুক্তিসঙ্গত তা নিয়ে এখনো দ্বিমত রয়েছে। তবে সাংস্কৃতিক লোকজ উপাদানে সমৃদ্ধ বাংলাদেশের উত্তরের সীমান্তবর্তী জেলা পঞ্চগড়। এ জেলার লোকসাহিত্য, লোকশিল্প, লোকপোশাক, লোকস্থাপত্য, লোকসংগীত, লোকবাদ্যযন্ত্র, লোকউৎসব, লোকমেলা, লোকাচার, লোকখাদ্য, লোকনাট্য, লোকক্রীড়া, লোকচিকিৎসা, ধাঁধা, প্রবাদ-প্রবচন, লোকবিশ্বাস, লোকপ্রযুক্তি, লোকজ যানবাহন, লোকভাষা প্রভৃতি অমূল্য ধারা স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর। বাঙালির হাজার বছরের ঐতিহ্য বাংলা লোকনাট্য। লোক পরিবেশনা শাণিত করে মানবিক চেতনাকে, মনকে করে প্রসন্ন। শান্তি ও পারস্পরিক সম্প্রীতির যে সংস্কৃতি এদশের মানুষ ধারণ করে আছে, জীবনের প্রতিক্ষেত্রে তা অনুসরণ করা বর্তমানে অতি জরুরী হয়ে দাড়িয়েছে। পঞ্চগড় জেলার লোকজ নানা উপাদানের মধ্যে লোকনাট্যের পরিবেশনা যেন এ অঞ্চলের মানুষে সত্তার সাথে মিশে রয়েছে। ‘হুলি’ পঞ্চগড় জেলার সবচেয়ে জনপ্রিয় পরিবেশনা। এটি একইসাথে জনপ্রিয় লোকসংগীত ও লোকনাট্য হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। হুলি গানের উদ্ভব মূলত হিন্দুধর্মের দোল উৎসবকে কেন্দ্র করে। কাজেই এদেশের ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারার শ্রেণীকরণে ধর্মনির্ভর নাট্যের প্রসঙ্গ বেশ বিস্তৃতভাবে আসে। ধর্মীয় উৎসবকে কেন্দ্র করে হুলি গানের উদ্ভব ঘটলেও তা ঐতিহ্যবাহী পরিবেশনার মাধ্যমে সর্বজনীন রূপ লাভ করে। ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারায় পঞ্চগড় জেলার হুলি গান হয়ে ওঠে একই সাথে জনপ্রিয় ও লোকনাট্যরূপে। জনপ্রিয় এই মিশ্র পরিবেশনায় সমসাময়িক বিষয় উপজীব্য হবার দরুণ এতে গ্রামীণ সমাজের শাশ্বত রূপ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ফুটে ওঠে। এ জেলার লোকঐতিহ্য তথা লোকসাহিত্যের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ উপাদানের মধ্যে লোকনাট্য একটি বিশেষ ও অনবদ্য ধারা হিসেবে জনমনে বিশেষ স্থান করে নিতে সক্ষম হয়েছে। এ অঞ্চলের অন্যান্য লোকনাট্যের মধ্যে ‘সত্যপীরের গান’-এর উদ্ভবও ঘটে ধর্মকে কেন্দ্র করে। ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, প্রতিটি ঐতিহ্যবাহী লোকনাট্যের বিষয়বস্তু প্রথমদিকে ধর্মকে কেন্দ্র করে আবির্ভূত হলেও সমাজের চিরায়ত যে রূপ ও সমাজের মানুষের জীবনযাত্রার প্রাত্যহিক প্রতিচ্ছবি মূল বিষয়বস্তু হিসেবে কোন না কোনভাবে অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে।

তবে, একটি পরিবেশনা যখন সমাজের মানুষের সামগ্রিক চিত্র তথা সমাজ বাস্তবতার অন্তর্নিহিত ভাব ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়, তখন তা জাতি-ধর্মের ঊর্ধ্বে বিচরণ করার মধ্যদিয়ে সার্বজনীন রূপ লাভ করে। আর সেই সাথে দেশের সাংস্কৃতিক ভাণ্ডারে পূর্ণতা দানকারী অমূল্য সম্পদ। তবে, বৃহত্তর ধর্ম মুসলমান-হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান এ সকলের অন্তরালেও এদেশের মানুষের একটি নিজস্ব ধর্মবোধ আছে; সেই সূত্রে এর ভেতর দিয়ে এদেশের মানুষ এক অসাম্প্রদায়িক চেতনায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। তাই সকল ধর্মকেন্দ্রিক পরিবেশনাই এখানকার জলবায়ুতে পুষ্টিলাভ করে এদেশের মানুষের রসবোধের সঙ্গে খুব সহজেই আত্মিক মেলবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে। সম্ভবত, এ কারণেই দেখা যায়, কোন একটি ধর্মমতনির্ভর পরিবেশনা অন্য ধর্মমতের মানুষ কর্তৃক অবলীলায় অভিনীত হয়ে থাকে। সমাজ সবসময় ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারার একটি নিজস্ব রূপ রক্ষা করে চলে; নাগরিক জীবনে তা নানাভাবে বিপর্যস্ত হলেও গ্রামের সরল জীবনযাপন করা লোকজন তা যুগের পর যুগ বহন করে চলেছে। হুলি গানের ধারক ও বাহক পঞ্চগড় জেলার গ্রামীণ জনগোষ্ঠী। হুলি গানের আবেদন এ অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে হয়ে ওঠে সর্বজনীন। হুলি গান পরিবেশনের মাধ্যমে শুধু এ অঞ্চলের প্রতিচ্ছবিই ফুটে ওঠে তা নয়, বরং তা সারা বাংলার খেটে-খাওয়া গ্রামীণ জনজীবনের প্রতিচ্ছবি ফুটিয়ে তোলে। পঞ্চগড় জেলার ঐতিহ্যবাহী মিশ্র পরিবেশনা 'হুলি গান' এ জেলার লোকসংস্কৃতির ভাণ্ডারকে পূর্ণতা দানের পাশাপাশি বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতির ভাণ্ডারে এক অনন্য সংযোজন।

প্রসঙ্গকথা

‘মুক্তিযুদ্ধে পঞ্চগড় অঞ্চলের লোককবিদের সাংগীতিক অবদান’ শিরোনামে মাস্টার্স থিসিসের ফিল্ডওয়ার্ক করতে গিয়ে পঞ্চগড় জেলার জনপ্রিয় লোকঐতিহ্য ও লোকনাট্য হুলি গানের বিষয়টি নিয়ে কাজ করার জন্য মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করি। যদিও ছোট বেলা থেকেই আমাদের গ্রামের সবার প্রিয় নজরুল চাচার কাছে হুলি গানের জনপ্রিয় ‘মফিজুল ফাতেরার গান’ নামক খাঁস বা রঙ পাঁচালী খুব আগ্রহ সহকারে শুনতাম। তবে, বিশিষ্ট ফোকলোরবিদ ড. নাজমুল হক স্যারের ফোকলোর বিষয়ক গবেষণাধর্মী গ্রন্থ পাঠের মাধ্যমে পঞ্চগড় জেলার জনপ্রিয় মিশ্র পরিবেশনা হুলি গান সম্পর্কে বিশদভাবে ধারণা লাভ করতে সক্ষম হই। পঞ্চগড় জেলার লোকসাহিত্য নিয়ে তাঁর অভূতপূর্ব গবেষণা আমাকে ব্যাপকভাবে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগীত বিভাগের সকলের প্রিয় শিক্ষক প্রসন্ন চিত্তের অধিকারী, বিশিষ্ট রবীন্দ্রসংগীতশিল্পী অধ্যাপক ড. শাহনাজ নাসরীন ইলা আপার প্রতি অসীম ভক্তি ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। তাঁর তত্ত্বাবধানে “পঞ্চগড় জেলার হুলি গানের পরিবেশনা শৈলী” শিরোনামে এম.ফিল. করার সুযোগ প্রদান করায় চির কৃতজ্ঞতায় বাধিত করেছেন। তিনি শুরু থেকেই আমার গবেষণাকর্মটির সার্বিক দিক অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে দেখভাল করেছেন। প্রয়োজনীয় গ্রন্থ ও উৎসের সন্ধান তিনি দিয়েছেন। গবেষণার পদ্ধতিগত ধারণাও তাঁর কাছ থেকে গ্রহণ করেছি। তাঁর আন্তরিক নির্দেশনা ও প্রেরণা আমাকে এই অভিসন্দর্ভ রচনার সহায়ক হয়েছে। কেবল শিক্ষক কিংবা তত্ত্বাবধায়ক হিসেবেই নন, তিনি আমার প্রকৃত অভিভাবকের দায়িত্বই পালন করেছেন। তাঁর প্রতি আমি আমৃত্যু ঋণী।

বিশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি সংগীত বিভাগের প্রিয় শিক্ষক, আমার এম.ফিল পরীক্ষা কমিটির সভাপতি ড. আকলিমা ইসলাম কুহেলী ম্যামের প্রতি। আমার বাউল গানের গুরু, প্রিয় শিক্ষক, সংগীতবিভাগের বিভাগীয় প্রধান ড. দেবপ্রসাদ দাঁ স্যারের প্রতি আমি অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। তিনি আমাকে বিভিন্ন সময়ে এ গবেষণাকর্মে সহায়তা করেছেন। আমি বিশেষভাবে ঋণী ড. সাইম রানা স্যারের প্রতি। তাঁর নিকট আমার গবেষণাকর্মের হাতেখড়ি। তাঁর অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের স্পর্শ পেয়ে ধন্য হয়েছি। আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি সদা হাস্যোজ্জ্বল ও প্রসন্ন চিত্তের অধিকারী ড. প্রিয়াংকা গোপ ম্যামের প্রতি। তিনি আমার গবেষণাকর্মের শুরু থেকেই নানাভাবে উৎসাহ যুগিয়েছেন। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি প্রিয় শিক্ষক ড. তপন কুমার সরকার স্যারের প্রতি। বিশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগীত বিভাগের প্রাক্তন শিক্ষক, নৃত্যকলা বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা, স্বাধীনতা পদকপ্রাপ্ত কিংবদন্তী রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা আপার প্রতি।

আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি খায়রুল আনাম শাকিল স্যারের প্রতি, কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আজিজুর রহমান তুহিন স্যারের প্রতি, মোহাম্মদ শোয়েব স্যারের প্রতি, সাবরিনা আক্তার টিনা ম্যামের প্রতি, টুম্পা সমাদ্দার ম্যামের প্রতি, এনামুল হক স্যারের প্রতি, স্বরুপ হোসেন স্যারের প্রতি, বিমান স্যারের প্রতি, মেহফুজ আল ফাহাদ ভাই এবং নাঈমা নাজ আপুসহ সংগীত বিভাগের সকল শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারীবৃন্দের প্রতি আমি গভীর কৃতজ্ঞতা

Dhaka University Institutional Repository

জ্ঞাপন করছি। গবেষণা সম্পর্কিত বই সংগ্রহে সহযোগিতার জন্য বিভাগের সেমিনারের কর্মকর্তা পলি চন্দ আইচ দিদির কাছেও আমি ঋণী। সবশেষে, অসীম ভক্তি ও শ্রদ্ধা নিবেদন করছি এদেশের সংগীত জগতের মহান পুরুষ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগীত বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত ড. মৃদুল কান্তি চক্রবর্তী স্যার-এর প্রতি। বিশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি থিয়েটার এণ্ড পারফরমেন্স স্টাডিস বিভাগের অধ্যাপক ড. সৈয়দ জামিল আহমেদ স্যার এবং অধ্যাপক ড. ইসরাফিল শাহীন স্যারের প্রতি।

অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন বাংলা একাডেমির উপপরিচালক ড. তপন বাগচীর প্রতি। তাঁর গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ অভিসন্দর্ভ প্রণয়নে সহায়তা করেছে। তিনি গবেষণাকর্মের সংশোধনে সর্বাত্মক সহায়তা করেছেন। বিশেষ কৃতজ্ঞতা বাংলা একাডেমির উপপরিচালক (চলতি দায়িত্ব) ড. সাইমন জাকারিয়ার প্রতি। তিনি তাঁর সংগ্রহের গুরুত্বপূর্ণ বই, জার্নাল এবং পরামর্শ প্রদান করে ধন্য ও ঋণী করেছেন।

এ গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করতে এর বাইরেও সহায়তা করেছেন শফিকুল ইসলাম স্যার, ড. হাবিবুর রহমান রাসেল স্যার (সহযোগী অধ্যাপক, ফোকলোর বিভাগ, রা.বি.), রফিকুল ইসলাম স্যার, নূরনবী জিন্নাহ স্যার, মনিরুল ইসলাম স্যার, আইয়ুব আলী স্যার, হীরেন স্যার, মানিক স্যার, নুর সালেহীন, হাসান আল বান্না ভাই, মোবারক স্যার, আবুল বাসার, এডভোকেট আবুল কালাম আজাদ লিটন, আবু বক্কর রনি, বাউল রইছউদ্দীন, মোবারক সাঁই, সরকার হায়দার, মানিক শাহ বাউল, বাউল শাহজাহান, রনি শীল, ইলিয়াস আলী, হিমেল রানা, শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানী আবু আরিফ, শিশু-মনোবিজ্ঞানী শারমিন আক্তার মুন্নী প্রমুখ। এছাড়াও আমার জন্মদাতা কৃষক পিতা এবং গর্ভধারিণী গৃহিণী মায়ের মানসিক ও আর্থিক সহায়তা ব্যতীত আদৌ গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করা সম্ভব হতো না।

করোনাকালে বিভিন্ন প্রতিবন্দকতা সত্ত্বেও হুলি গানের বেশ কয়েকটি পরিবেশনা সরাসরি উপভোগের লব্ধ জ্ঞান, প্রবীণ কয়েকজন অভিনেতা, দর্শক ও নাট্যকমীর সান্নিধ্য এবং তাদের বাস্তব অভিজ্ঞতার উপলব্ধি, পাঠ-সমীক্ষা ও পর্যালোচনা গবেষণাকর্মটি প্রণয়নে সহায়ক হয়েছে। এ গবেষণাকর্মটি হুলি গানসহ এ অঞ্চলের অন্যান্য পরিবেশনারীতির অবস্থার উন্নয়নে ও বিলুপ্তপ্রায় লোকজ পরিবেশনাগুলোর পুনরুত্থানে সহায়ক হবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

ভূমিকা ০৯

প্রথম অধ্যায়

পঞ্চগড় জেলার নৃতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয় ১১

দ্বিতীয় অধ্যায়

ঐতিহ্যবাহী লোকনাট্যের পরিবেশনা রীতি ৩৭

তৃতীয় অধ্যায়

পঞ্চগড় জেলার হুলি গানের পরিবেশনা শৈলী ৭৬

চতুর্থ অধ্যায়

দর্শক ও কুশীলবের দৃষ্টিতে হুলি গানের বর্তমান অবস্থা ও সম্ভাবনা ১০১

উপসংহার ১২৯

পরিশিষ্ট-১:

চিত্র পরিচিতি ১৩১

পরিশিষ্ট-২:

হুলি গানের পালায় ব্যবহৃত কিছু গান ও পালার অংশবিশেষ ১৩৪

গ্রন্থপঞ্জি ১৪২

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

হিমালয়কন্যা খ্যাত বাংলাদেশের সর্ব-উত্তরের সীমান্তবর্তী জেলা পঞ্চগড়। এ জেলার তিনদিকে পার্শ্ববর্তী বন্ধুরাষ্ট্র ভারতের অবস্থান। উত্তরবঙ্গ বলতে বর্তমান বাংলাদেশের রংপুর বিভাগ (পূর্বের বৃহত্তর রাজশাহী বিভাগ) এবং প্রতিবেশি রাষ্ট্র ভারতের উত্তর দিনাজপুর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার জেলাসমূহকে মনে করা হয়। ভৌগোলিক, রাজনৈতিক ও ভাষাতাত্ত্বিক গুরুত্বের প্রেক্ষাপটে এ অঞ্চলের নামকরণ করা হয়েছে উত্তরবঙ্গ। তবে, ইতিহাস অনুসন্ধানে জানা যায়, এ অঞ্চলটি প্রাচীন বাংলার পুণ্ড্র জনপদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতকের দিকে চীনা পরিব্রাজক হিউ-য়েন-সাঙ্ এর লেখায় বঙ্গ দেশের যে পাঁচটি রাজ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়, পুণ্ড্র ছিল তার মধ্যে অন্যতম। এছাড়াও এ অঞ্চলটি বরেন্দ্র নামে পরিচিত ছিল। পাল রাজাদের শাসনামলে কবি সন্ধ্যাকর নন্দী তাঁর জন্মস্থান শ্রেষ্ঠত্ব প্রসঙ্গে উত্তরবঙ্গ অঞ্চলকে ‘বরেন্দ্র’ বলে উল্লেখ করেছেন। বাংলার শ্রেষ্ঠ সুলতান হোসেন শাহ ‘পঞ্চগৌড়েশ্বর’ ছিলেন বলে মধ্যযুগের বিখ্যাত কবি যশোরাজ খান উল্লেখ করেছেন।

ভৌগোলিক, নৃতাত্ত্বিক ও ভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে পঞ্চগড় জেলার লোকসংস্কৃতি স্বতন্ত্র বৈচিত্র্যে ভাস্বর। লোকজ নানা উপাদানে পরিপূর্ণ এ অঞ্চল। লোকসাহিত্যে জনপ্রিয় নানা উপাদানের মধ্যে লোকসংগীত ও লোকনাট্য পঞ্চগড় জেলাকে বিশিষ্টতা দান করেছে। পঞ্চগড় জেলার জনপ্রিয় লোকনাট্য ‘হুলির গান’ নিঃসন্দেহে একটি নান্দনিক পরিবেশনা শিল্প। গবেষণার বিষয়বস্তু –পঞ্চগড় জেলার হুলি গানের পরিবেশনাশৈলী নিয়ে আলোকপাত, এর বর্তমান অবস্থা, শিল্পী ও অভিনেতাগণ, তাদের পরিবেশনাশৈলী এবং বর্তমানে তারা কী সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন, এছাড়াও হুলির গানের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রাজ্ঞজনের মতামত বিশ্লেষণ করা। এ বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে অধ্যায়গুলো যেভাবে সাজানো হয়েছে তা নিম্নরূপ :

প্রথম অধ্যায়ে পঞ্চগড় জেলার নৃতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। পঞ্চগড় জেলার ভৌগোলিক অবস্থান ও নৃতাত্ত্বিক পরিমণ্ডল বিবেচনায় এ অঞ্চলের সাংস্কৃতিক যে সমৃদ্ধি রয়েছে, তা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। লোকসাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলোর মধ্যে লোককাহিনী, লোকবিশ্বাস, লোকধর্ম, লৌকিক দেবদেবী, লোকছড়া, লোকধাঁধা, লোকপ্রবাদ, লোকসংগীত, লোকনাট্য, লোকনৃত্য, লোকউৎসব, লোকাচার, খাদ্যাভাস, লোকক্রীড়া, লোকমন্ত্র, লোকচিকিৎসা, লোকপোশাক, লোকপ্রযুক্তি প্রভৃতি আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে ঐতিহ্যবাহী লোকনাট্যের ধারা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। এদেশের ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারার বিষয়বৈচিত্র্য ও আঙ্গিক বৈচিত্র্যের বিবেচনায় ঐতিহ্যবাহী লোকনাট্য সম্পর্কে আলোচনা করার পাশাপাশি এর পরিবেশনার দিকটি বিশেষভাবে দৃষ্টিপাত করা হয়েছে। ঐতিহ্যবাহী লোকনাট্যের মধ্যে কুশান গান, কান্দনী-বিষহরির গান, জারি গান, গাজীর গান, মাদার পীরের গান, কবিগান, গম্ভীরা, আলকাপ গান, ধামাইল গান, যাত্রা ইত্যাদির আঙ্গিক পরিচয় ও পরিবেশনারীতি আলোকপাত করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়টি মূলত ‘পঞ্চগড় জেলার হুলি গানের পরিবেশনাশৈলী’ নিয়ে ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারার আলোকে বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা করা হয়েছে। ঐতিহ্যবাহী লোকনাট্য হুলির গানের বিষয়বৈচিত্র্য ও আঙ্গিক বৈচিত্র্যেও আলোচনা হিসেবে হুলির গানের নামকরণ, হুলি গানের উদ্ভব ও বিকাশ, হুলি গানের পৃষ্ঠপোষক ও বায়না, হুলি গানের পরিবেশনার সময়, হুলি গানের মঞ্চ বা আসর, আলোকসজ্জা, সাজঘর, হুলি গানে পোশাকের ব্যবহার, হুলি গানের অভিনয় উপকরণ, বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার, সুর বৈচিত্র্য ও তালের ব্যবহার, হুলি গানের ভাষা, হুলি গানের পরিবেশনারীতি হিসেবে মান পাঁচালী বা শাস্ত্রীয় এবং রঙ পাঁচালী বা খাস পাঁচালী সম্পর্কে বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে প্রবীণ দর্শক ও কুশীলবের দৃষ্টিতে হুলি গানের বর্তমান অবস্থা ও সম্ভাবনা সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে হুবহু তুলে ধরা হয়েছে। হুলি গানের পরিবেশনারীতির বিবর্তন, এর বিষয়বস্তুর পরিবর্তন, এর সামাজিক পৃষ্ঠপোষকতা ও হুলি গানের শিল্পীদের বর্তমান অবস্থা এবং সর্বোপরি হুলি গানের পরিবেশনা ধরে রাখার যাবতীয় নিরীক্ষণ এ অধ্যায়ে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

পরিশেষে উপসংহার, প্রয়োজনীয় আলোকচিত্র, হুলি গানের পালার ব্যবহৃত গান ও কয়েকটি পালার কিয়দংশ এবং গ্রন্থপঞ্জী সংযোজনের মাধ্যমে গবেষণাপত্রটি সম্পন্ন করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

পঞ্চগড় জেলার নৃতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয়

১.১ নৃতাত্ত্বিক পরিচয়

সবুজ সোনা খ্যাত মনোরম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি বাংলাদেশের সর্ব উত্তরের জেলা পঞ্চগড়। হিমালয়ের কন্যা খ্যাত পঞ্চগড় জেলা ১৯৪৭ সালের পূর্ব পর্যন্ত পার্শ্ববর্তী বন্ধুরাষ্ট্র ভারতের জলপাইগুড়ি জেলার অন্তর্গত একটি গুরুত্বপূর্ণ মহকুমা ছিলো। বর্তমানে বৃহত্তর দিনাজপুর, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, কোচবিহার জেলা পরিবেষ্টিত বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী পঞ্চগড় জেলার জনগোষ্ঠী নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন বৈচিত্র্যপূর্ণ। এ জেলার জনগোষ্ঠীর মধ্যে হিন্দু-মুসলিম, রাজবংশী, সাঁওতাল, ওঁরাও, ভূইমাল, কামার, কুমার, বেহারা, কাহার, সুনরী প্রভৃতি জাতিগোষ্ঠীর নৃতাত্ত্বিক প্রভাবে গড়ে উঠেছে এক নতুন জনপ্রবাহ। জনগোষ্ঠীর এরূপ বৈচিত্র্যময় পঞ্চগড় জেলার নৃতাত্ত্বিক ভিত্তি গড়ে তুলেছে বলে জানা যায়। নৃতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিকগণের ধারণা অনুযাযী, "অশোকের শিলালিপিতে এক লিখিত অধ্যাদেশে অসহায় প্রজাদের ভাগ্য পরিবর্তনের আভাস পাওয়া যায়, এমনকি তাদের সুদিন ফিরে আনার নিদর্শন মেলে।"[১] এছাড়া, "উত্তরবঙ্গে বসবাসকারী জনগণের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন বলে মনে করা হয় পুন্ড্র জনপদে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীকে।"[২]

বাংলাদেশের মানুষের দৈহিক গড়নে বিভিন্ন প্রাচীন জাতির প্রভাব রয়েছে। বিবর্তনের ধারায় যুগে যুগে বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর প্রভাবে এদেশে গড়ে উঠে এক মিশ্র জাতিগোষ্ঠী। এদেশের মানুষের মুখের অবয়ব বেশ লম্বা ও চওড়া আকৃতির লক্ষ্য করা যায়। "এদেশের জনগোষ্ঠী দৈহিক গঠনে মেলানিড, অ্যালপাইন ও আদি অস্ট্রেলীয় নৃগোষ্ঠীর মিশ্রিত রূপ। এছাড়া বৃহত্তর উত্তরাঞ্চলের জনধারায় বিশেষ করে দিনাজপুর, রংপুর, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি এসব অঞ্চলের মানুষের মধ্যে মঙ্গোলীয়, অ্যালপাইন, আদি অস্ট্রেলীয় এবং দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠীর বেশ প্রভাব রয়েছে।"[৩] ইতিহাস অনুসন্ধানে জানা যায় যে, পঞ্চগড় জেলার জনগোষ্ঠী আদি অস্ট্রেলীয়, অ্যালপাইন ও মঙ্গোলীয়দের মিশ্রিত রূপায়নে গড়ে উঠেছে। তবে, নিম্ন বর্ণের উপজাতিদের মধ্যে আদি অস্ট্রেলীয়দের বিশেষ প্রভাব রয়েছে বলে নৃতাত্ত্বিকগণ ধারণা কওে থাকেন। পঞ্চগড় জেলার জনগোষ্ঠিতে একটি বড় অংশ অস্ট্রেলীয়দের প্রভাবে গড়ে উঠেছে বলে অভিমত পাওয়া যায়। দেহের গড়নে বাঙ্গালিদের কারো কারো চ্যাপ্টা মাথা, বোঁচা নাক, কপালের দিকে কিছুটা ঢালূ এবং চাপা, মোটা ভ্রু , লম্বা থুতনি একটু নিচু, কোকড়া চুল, বাদামী বা ঘন কালো চুল তবে সারা দেহে লোমের পরিমাণ খুবই কম এবং দেহের গড়ন মাঝারি থেকে ক্ষুদ্রাকার।

নৃতাত্ত্বিকদের ধারণা অনুযায়ী, “একই জাতিগোষ্ঠী চিহ্নিত করার গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন- রক্তবর্ণের মাধ্যমে, গায়ের রঙের মাধ্যমে, নাকের আকৃতির দ্বারা, মাথার আকার ও মুখের পরিমাপ এবং চুলের রং ও বিশিষ্ট অনুসরণের মাধ্যমে নির্দিষ্টতা প্রমাণ করা হয়ে থাকে।”[৪] মানুষের দৈহক পরিমাপ কবে গ্রহণ করা হয়েছিল তার সঠিক তথ্য জানা বেশ দূরহ। তবে, “উপমহাদেশে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর প্রথম পরিমাপ হয় ১৯০১ সালে গ্রহণ করা হয় বলে জানা যায়। তবে প্রথম দিকে দৈহিক পরিমাপ কয়েকজন দেশীয় কর্মচারীর মধ্যে পরিচালিত হয়েছিল যেখানে বাঙ্গালীদের গোল মাথার প্রাধান্যের কারণ হিসেবে মঙ্গোলীয়দের ও অ্যালপাইনদের প্রভাব রয়েছে বলে ধারণা করা হয়।”[৫]

পঞ্চগড় জেলায় আদি-অস্ট্রেলীয়দের অন্তর্গত বেশকিছু আদিবাসী, উপজাতি রয়েছে। যাদের মধ্যে- “সাঁওতাল, কামার, কুমার, সুনরি, ভুইমালি, ওঁরাও প্রভৃতি নিম্নশ্রেণির জাতিগোষ্ঠী অন্তর্ভুক্ত। এ অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর মধ্যে মাহালি , পাহাড়িয়া, ওঁরাও, মুন্ডা, সাঁওতাল প্রভৃতি ক্ষুদ্র জাতিসত্তার নৃতাত্ত্বিক গুরুত্ব খুবই সামান্য বলে ধারণা করা হয়।”[৬] এ জেলায় নিম্নবর্ণের হিন্দু মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে এই জনধারার প্রভাব অতিমাত্রায়। এছাড়াও সম্ভ্রান্ত মুসলিম ও হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যেও আদি অস্ট্রেলীয় এবং অ্যালপাইন নামক দুটি প্রধান ধারার মানুষের নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য সবচেয়ে বেশি বিরাজমান। এছাড়া “মঙ্গোলীয় নৃগোষ্ঠীদের নৃতাত্ত্বিক প্রভাব এ পঞ্চগড় অঞ্চলের পলিয়া, কোচ, মেচ জাতি গঠনে প্রধান রূপে প্রতীয়মান।”[৭]

পঞ্চগড় জেলার জনগোষ্ঠিতে বিশেষ করে কোচ, পলিয়া ও রাজবংশীদের মধ্যে মঙ্গোলীয়দের প্রভাব রয়েছে বলে ধারণা করা হয়। ঐতিহাসিক ও নৃতাত্ত্বিকদের ধারণা মতে, এদের আগমন বহুকাল পূর্বে মালয় উপদ্বীপ, বার্মা বা ব্রহ্মদেশ ও বিশেষ করে সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চল ও দ্বীপ হতে। এছাড়াও এ অঞ্চলে আরো ছোট ছোট বেশকিছু সম্প্রদায় রয়েছে যারা সুদীর্ঘকাল যাবত বসবাস করে আসছে। তবে কোচ ও রাজবংশী জনগোষ্ঠী বৃহত্তর উত্তরাঞ্চলে জনসংখ্যার দিক থেকে সবচেয়ে বেশি বলে ধারণা করা হয়। “ঐতিহাসিকদের ধারণা, এদের বসবাস ছিল হিমালয়ের পাদদেশের বিভিন্ন অঞ্চল বিশেষ করে রংপুর, বৃহত্তর দিনাজপুর, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, ঠাকুরগাঁও, এমনকি পঞ্চগড় অঞ্চলে।”[৮] কোচ, মেচ ও রাজবংশী সম্পর্কে জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ারসন- এর মতামত হলো-

> “The Koch, Mech and Bodo all connoted the same tribe or at most different steps of the same tribe.”[৯]

বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন নিদর্শন চর্যাপদের ২৮ তম পদ বিশ্লেষণ করলে আমরা উত্তরবঙ্গে বসবাসকারী শবর জাতির সংসার জীবনের অস্তিত্ব সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে পারি। “পাল রাজাদের শাসনামলে উঁচু টিলা বা পর্বতে

শবর জাতির অস্তিত্ব ছিল বলে চর্যাপদের ২৮ নং পদ হতে অনুমান করা যায়।"[১০] এছাড়া, পাল যুগে প্রাচীন বাংলার সমাজ ও রাজনীতিতে বেশ আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হয় কৈবর্ত জাতি। তাদের উত্তরসূরীরা বর্তমানে জেলে ও মাঝি হিসেবে পরিলক্ষিত। "কালের বিবর্তনে প্রাচীন প্রতিনিধিত্বকারী কৈবর্ত জাতি আর্য সমাজের নিম্ন স্তরে স্থান করে নেয়।"[১১]

পঞ্চগড় জেলার জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে হলে ৬০ বছরের বেশি সময় ধরে অতিবাহিত পালিত ধর্ম ও আদিবাসী, উপজাতি গোত্রভিত্তিক পরিসংখ্যান অনুসরণ করতে হয়। "কোচদের একটি অংশ পরবর্তীকালে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে কেওট রাজবংশী নামে পরিচিতি লাভ করে বলে ধারণা করা হয়।" [১২] তবে, পঞ্চগড় জেলার অসংখ্য কোচ, মেচ জনগোষ্ঠী ধর্ম পরিবর্তন করে তাদের পূর্ব পরিচয় মুছে ফেলেছে বলে জানা যায়। এছাড়া, "পঞ্চগড় জেলার বিভিন্ন স্থানে ষাট ও সত্তরের দশকে ময়মনসিংহ, নোয়াখালী, কুমিল্লা, ঢাকা, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, শিলিগুড়ি এসব অঞ্চল থেকে লক্ষাধিক মানুষের আগমন ঘটে ও বসতি স্থাপিত হয়। তাদের ক্রমোন্নতির ফলে পঞ্চম থেকে ষষ্ঠ শতকে পুন্ড্র জনপদটি গুপ্ত রাজ্যের একটি প্রধান অংশ হিসেবে পরিণত হয়।" [১৩] পঞ্চগড় জেলায় বিভিন্ন সময়ে ভৌগোলিক কারণে বিভিন্ন দেশ হতে মুসলিম জাতির আবির্ভাব হয়েছিল। এছাড়াও এদেশের উত্তরবঙ্গে "পঞ্চগড় অঞ্চলে সেমেটিক, পারসিক, তুর্কি, আফগান প্রভৃতি মুসলিম জাতিগোষ্ঠীর আগমন ঘটে ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে। যদিও এসকল মুসলিম জনগোষ্ঠী পরবর্তীতে এ অঞ্চলে ব্যবসা ও শাসনের সুযোগ লাভ করে বলে জানা যায়।"[১৪] ঐতিহাসিক অনেক জাতি বিশ্লেষণে এটা প্রতীয়মান হয় যে, পঞ্চগড় জেলায় হিমালয় সংলগ্ন পাহাড়ি অঞ্চল, চীন, তিব্বত, ভুটান প্রভৃতি অঞ্চল হতে প্রচুর মানুষের আগমন ঘটেছে এবং বসতি স্থাপিত হয়েছে। বহিঃর্বিশ্ব হতে আগত ভিনদেশীরা উত্তরবঙ্গের জনস্রোতে মিলে একাকার হয়ে যায়। তবে, পঞ্চগড় জেলার কোচ ও পলিয়া জাতির নির্দিষ্ট পরিসংখ্যান না পাওয়ার কারণ হিসেবে তাদের আত্মপরিচয় গোপনের বিষয়টি ধারণা করা হয়। যদিও কোচ ও রাজবংশীদের দৈহিক গড়নে সাদৃশ্য রয়েছে তবে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই যে, এ জেলায় অমুসলিম জনগোষ্ঠীর অধিকাংশই রাজবংশী, কোচ ও পলিয়ার অন্তর্গত। পঞ্চগড় জেলায় বসবাসরত হিন্দু সম্প্রদায়ের সিংহভাগ কোচ ও পলিয়া জাতির অন্তর্গত বলে অনুমান করা হয়। তবেই হিন্দুদের সনাতন উপাসনা পদ্ধতি থেকে কোচ, রাজবংশীদের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য রয়েছে। ড. নাজমুল হক এর মতে, "পঞ্চগড় জেলায় বসবাসকারী কোচদের প্রধান ও প্রথম নায়কের নাম হাজো। আর হাজো ছিলেন বোডো জাতির অন্তর্ভুক্ত। কোচদের উত্তরসূরিদের বসবাস ছিল বর্তমান পঞ্চগড় জনপদ সংলগ্ন। পরবর্তীতে, কোচ নায়ক হাজোর দৌহিত্রদ্বয় কোচবিহার ও জলপাইগুড়ির রাজা হতে সক্ষম হন আর এভাবেই উপজাতির পর্যায় থেকে রাজবংশী কোচদের উন্নীত হওয়া এবং হিন্দু ধর্ম গ্রহণের মধ্য দিয়ে কোচ নাম মুছে ফেলার প্রথম চেষ্টা। আর এভাবেই রাজবংশী নামের উৎপত্তি। তারা

নিজেদেরকে রাজবংশী ক্ষত্রিয় বলে পরিচয় দিতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। পঞ্চগড় জেলার লৌকিক বিশ্বাস, সাংস্কৃতিক উৎসব ও চর্চায় রাজবংশী জনগোষ্ঠীর অবদান অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। যার ফলে নৃতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এ অঞ্চলে গড়ে উঠেছে একটি স্বতন্ত্র জনগোষ্ঠী।"[১৫]

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এটাই প্রতিয়মান হয় যে, রাজবংশী, কোচ ও পলিয়া এ তিনটি প্রধান জনগোষ্ঠী ছাড়াও আরো বেশ কয়েকটি নিম্নশ্রেণির জনগোষ্ঠীর প্রভাবে পঞ্চগড় অঞ্চলে যে একটি মিশ্র নৃতাত্ত্বিক জনধারার সৃষ্টি হয়েছে এ বিষয়ে দ্বিমত থাকার কথা নয়। "পঞ্চগড় জেলায় বর্তমানে মুসলিম জাতির বসবাস সিংহভাগ বা প্রায় ৮১ শতাংশ, এরপরেই রয়েছে হিন্দু সম্প্রদায় প্রায় ১৭ শতাংশ, খ্রিস্টান প্রায় ০.২৪ শতাংশ, আদিবাসীদের সংখ্যা কমে বর্তমানে দাড়িয়েছে মাত্র ০.২১ শতাংশ এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের জনগোষ্ঠীর সংখ্যা রয়েছে প্রায় ০.১২ শতাংশের মতো।"[১৬]

মানচিত্র : ১

বৃহত্তর উত্তরবঙ্গের নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর জনবিন্যাস চিত্র

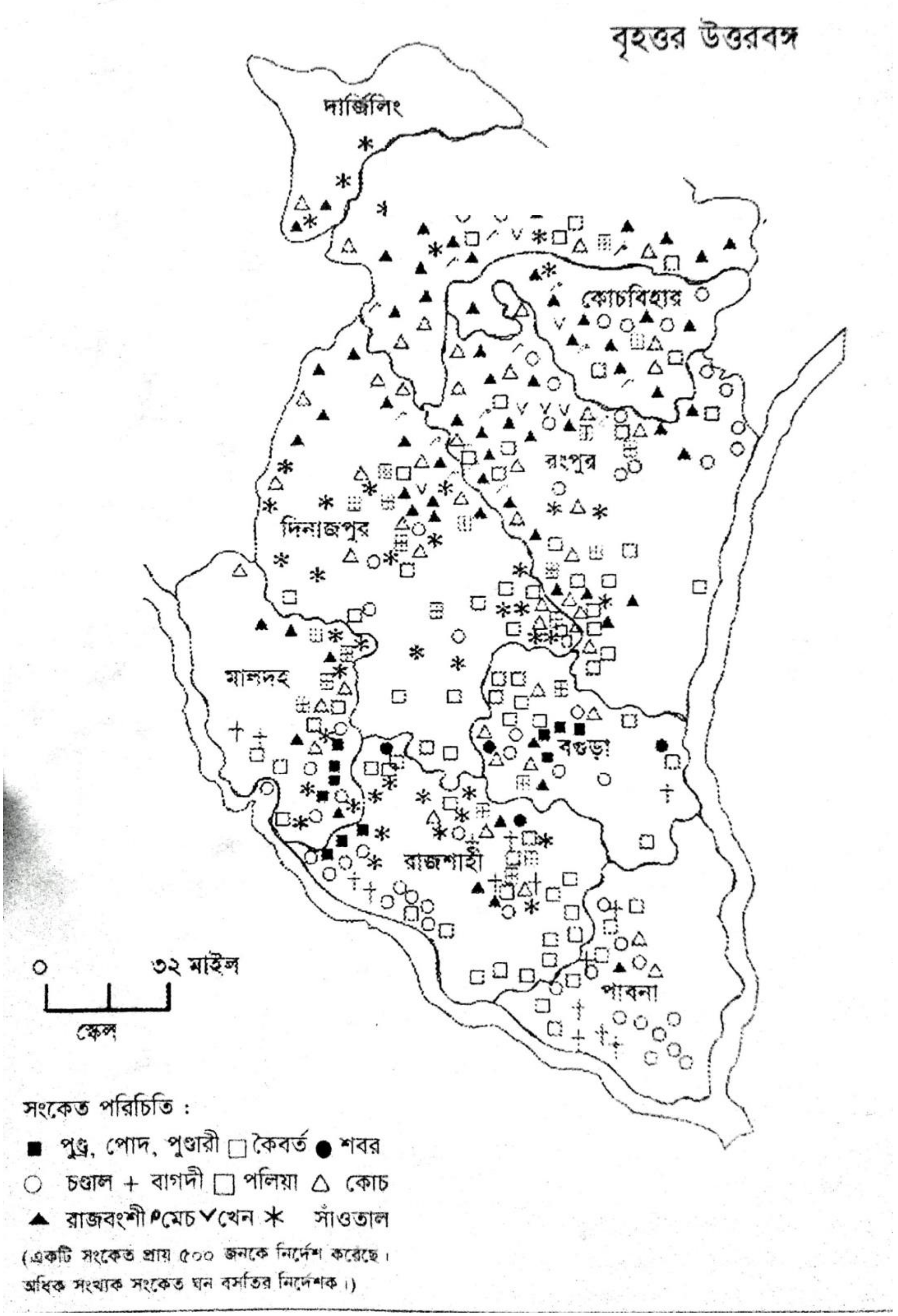
বৃহত্তর উত্তরবঙ্গ
দার্জিলিং
কোচবিহার
রংপুর
দিনাজপুর
মালদহ
বগুড়া
রাজশাহী
পাবনা
০
৩২ মাইল
স্কেল
সংকেত পরিচিতি :
■ পুণ্ড্র, পোদ, পুণ্ডারী □ কৈবর্ত ● শবর
○ চণ্ডাল + বাগদী □ পলিয়া △ কোচ
▲ রাজবংশী ᴾমেচ ✓খেন ✳ সাঁওতাল
(একটি সংকেত প্রায় ৫০০ জনকে নির্দেশ করেছে।
অধিক সংখ্যক সংকেত ঘন বসতির নির্দেশক।)

মানচিত্র : ২

পঞ্চগড় জেলার নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর জনবিন্যাস চিত্র

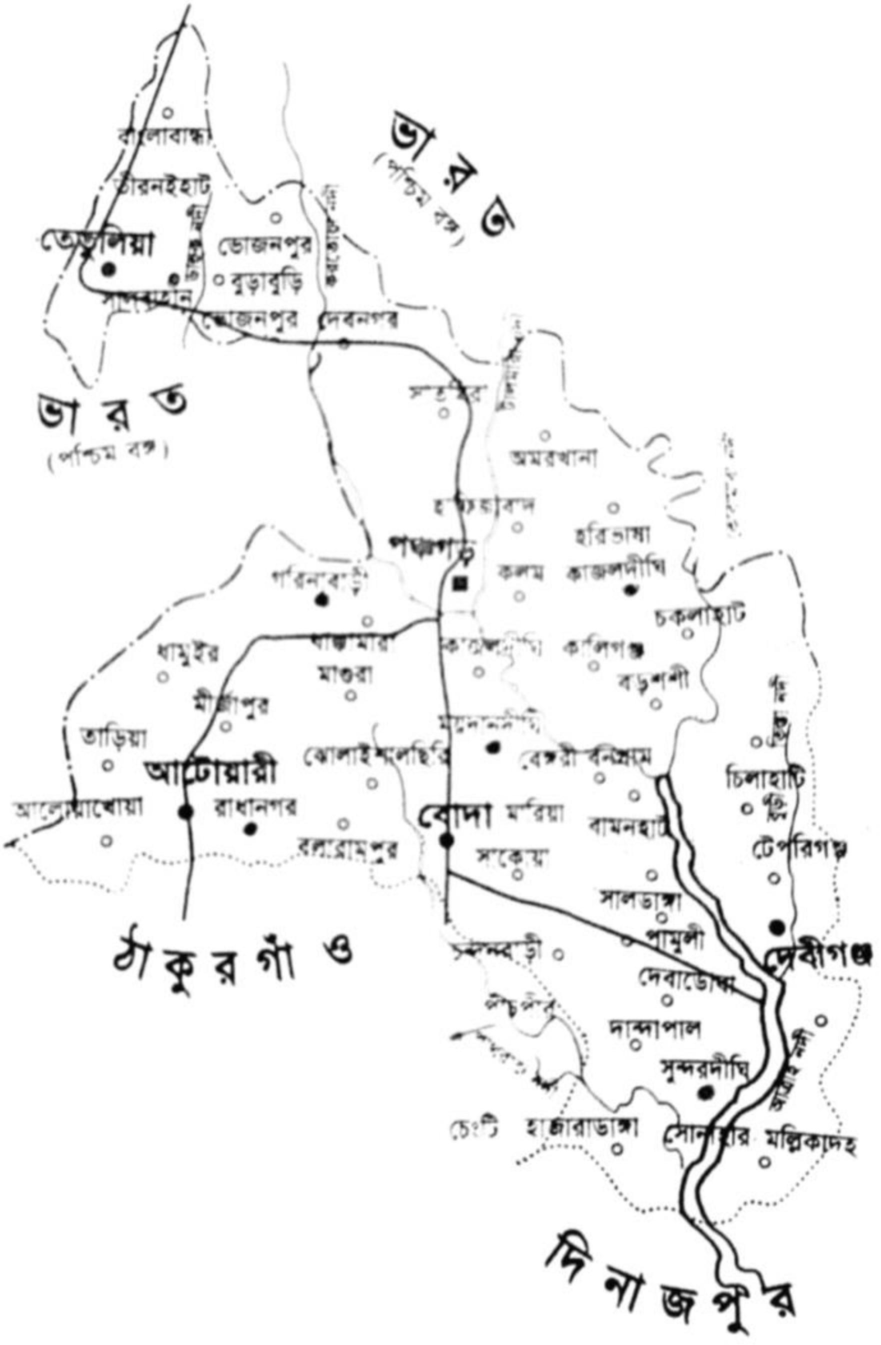
বাংলাবান্ধা
তিরনইহাট
তেঁতুলিয়া
ভোজনপুর
বুড়াবুড়ি
শালবাহান
ভজনপুর
দেবনগর
ভারত (পশ্চিম বঙ্গ)
ভারত (পশ্চিম বঙ্গ)
সাতমেরা
অমরখানা
হাফিজাবাদ
হরিভাষা
পঞ্চগড়
কামাত
কাজলদীঘি
গরিনাবাড়ী
চকলাহাট
ধামোর
মাগুরা
কালিগঞ্জ
বড়শশী
মীর্জাপুর
তাড়িয়া
আটোয়ারী
ঝলইশালশিরি
বেংহারী বনগ্রাম
আলোয়াখোয়া
রাধানগর
বলরামপুর
বোদা
মাড়েয়া
বামনহাট
চিলাহাটি
টেপরিগঞ্জ
সাকোয়া
সালডাঙ্গা
পামুলী
ঠাকুরগাঁও
চন্দনবাড়ী
দেবীগঞ্জ
দেবাডোঙ্গা
দন্ডপাল
সুন্দরদীঘি
চেংঠি
হাজরাডাঙ্গা
সোনাহার
মল্লিকাদহ
দিনাজপুর

পঞ্চগড় জেলার মানচিত্র

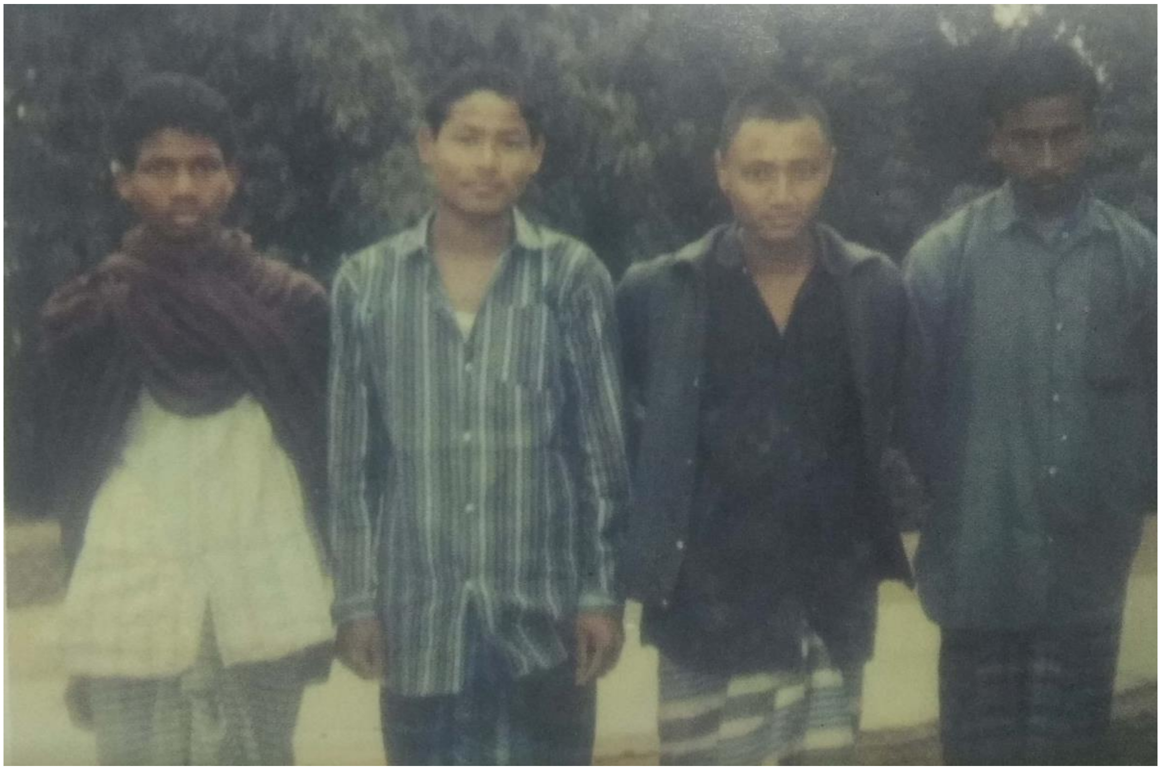

আলোকচিত্র- ১ : পঞ্চগড় জেলার বিভিন্ন নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী (বা দিক থেকে) নিগ্রোয়েড, মঙ্গোলয়েড এবং প্রোট-অস্ট্রোলয়েড

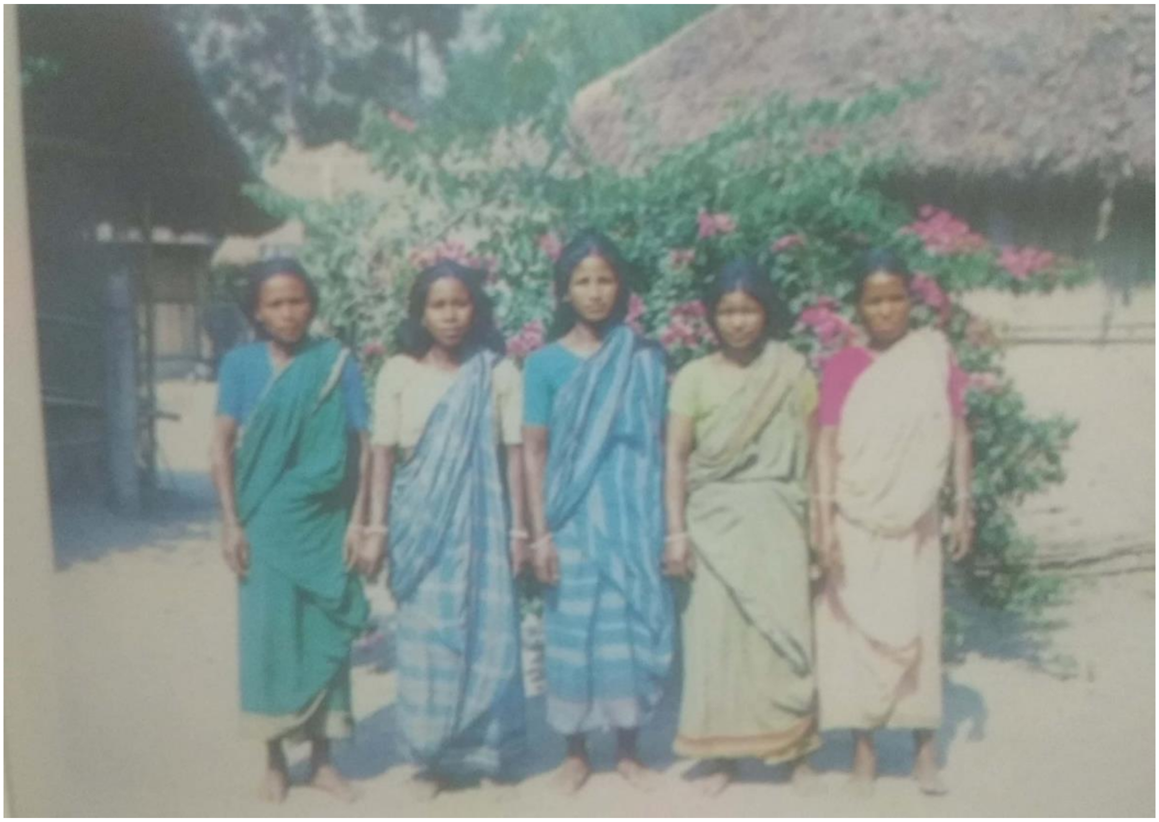

আলোকচিত্র- ২ : পঞ্চগড় জেলার দেবীগঞ্জ উপজেলায় বসবাসরত ‘বোডো’ জনগোষ্ঠী

আলোকচিত্র- ৩ : পঞ্চগড় জেলার ‘মঙ্গোলীয়’ (বর্তমান পরিচয় ‘মালী) জনগোষ্ঠী

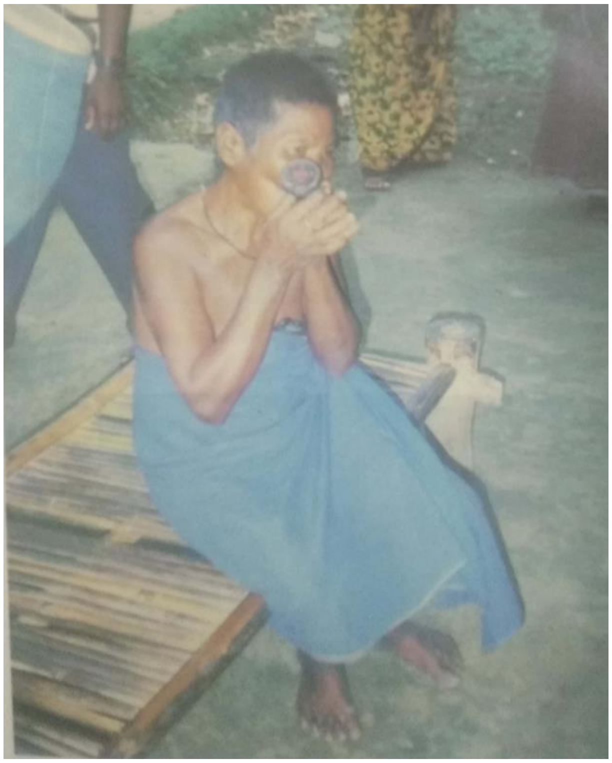

আলোকচিত্র- ৪ : পঞ্চগড় জেলার দেবীগঞ্জে বসবাসরত বকুনি পরিহিতা কোচ রমণী

১.২. সাংস্কৃতিক পরিচয়

সবুজ সোনার দেশ তথা হিমালয় কন্যাখ্যাত পঞ্চগড় জেলার অবস্থান বাংলাদেশের সর্ব-উত্তরে। ক্ষুদ্র ভূখণ্ডের এ জেলা ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক অবস্থানের দিক থেকে ঐতিহ্যময় সাংস্কৃতিক গুরুত্ব বহন করে। "সংস্কৃতি হলো জীবনের এক গভীরতম উপলব্ধির শৈল্পিক বহিঃপ্রকাশ, যা মানবমনকে করে আন্দোলিত।"[১৭] বহুকাল ধরেই এ অঞ্চলের শিল্প, সাহিত্য, সংগীত, নাটক, নৃত্যকলা প্রভৃতি কলার সকল শাখা ছিল স্বীয় ঐতিহ্যের ভাস্বরও। পঞ্চগড় জেলার সাংস্কৃতিক ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে এ অঞ্চলের মানুষের দীর্ঘদিনের লালিত লোকসংস্কৃতি। "একটি সংহত সমাজের মানুষ মৌখিকভাবে বা লিখিত আকারে অর্জিত অভিজ্ঞতার আলোকে ঐতিহ্যনির্ভর সৃষ্টিই লোককলা হিসেব বিবেচ্য।"[১৮] লোকসংস্কৃতির নানা উপাদানে পরিপূর্ণ উত্তরের এই জেলা। লোকসংস্কৃতি বলতে সাধারণত গ্রামীণ সংস্কৃতিকেই বুঝানো হয়ে থাকে। "ব্রিটিশ লোকবিজ্ঞানী উইলিয়াম থমসন ১৮৪৬ সালে 'লোকসংস্কৃতি' বা সাংস্কৃতিক লোকজ উপাদান বোঝাতেই Folklore শব্দটির প্রথম ব্যাবহার করেন।"[১৯] লোকজ উপাদানের মধ্যে এ জেলার লোকসাহিত্য, লোকশিল্প, লোকপোশাক, লোকস্থাপত্য, লোকসংগীত, লোকবাদ্যযন্ত্র, লোকউৎসব, লোকমেলা, লোকাচার, লোকখাদ্য, লোকনাট্য, লোকক্রীড়া, লোকচিকিৎসা, ধাঁধা, প্রবাদ-প্রবচন, লোকবিশ্বাস, লোকপ্রযুক্তি, লোকজ যানবাহন, লোকভাষা প্রভৃতি অমূল্য ধারা স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর।

১.২.১. পঞ্চগড় জেলার লোকসাহিত্য

উত্তরবঙ্গের লোকসাহিত্যের নৃতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক সমীক্ষা গন্থে লোকসাহিত্য সম্পর্কে বলা হয়েছে-"লোকসাহিত্য হচ্ছে গ্রামীণ পরিবেশে বসবাসকারী সাধারণ মানুষের সৃজনধর্মী, কল্পনাপ্রবণ, সৌন্দর্যপিপাসু ও ব্যবহারিক জ্ঞানের কাব্যিক ও গদ্যধমী বহিঃপ্রকাশ। মৌখিক মাধ্যমে পরিভ্রমণ প্রবণতা এর প্রধান লক্ষণ।"[২০]

লোকসাহিত্যকে বাদ দিয়ে আমরা একটি জাতির সংস্কৃতিকে বিশ্লেষণ করতে পারি না। "মৌখিক ধারার এ সাহিত্য অতীত ঐতিহ্যকে অবলম্বন করে একটি বিশিষ্ট ভৌগোলিক পরিমণ্ডলে গ্রামীণ সমাজ উৎসারিত ও বহমান।"[২১]

এ জেলার লোকসাহিত্য সম্বন্ধে নিম্নে আলোকপাত করা হলো:-

ক. লোককাহিনী: এ জেলার লোকসাহিত্যের মধ্যেও ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। লোকসাহিত্যের মধ্যে লোককাহিনী একটি বিশেষ স্থান দখল করে রয়েছে। পঞ্চগড় জেলা লোকসাহিত্যে পরিপূর্ণ। লোকগল্প বা লোককাহিনী বা কিস্‌সা বা রূপকথা বা উপকথা এ অঞ্চলের লোকসংস্কৃতির ভাণ্ডারকে করেছে সমৃদ্ধ। পঞ্চগড় জেলার লোকসংস্কৃতি গ্রন্থমালায় উল্লেখ আছে, "লোক পরম্পরায় মুখে মুখে প্রচলিত, গদ্যে বর্ণিত দীর্ঘ কাহিনীমূলক গল্পকে বলা হয় লোককাহিনী (Folktale)।"[২২] লোকগল্প, লোককাহিনী, রূপকথা, উপকথার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- জীবজন্তুর কাহিনি, সাংসারিক কাহিনি, পুরাকাহিনি, রূপকাহিনি, ভৌতিক কাহিনি, বোকাদের কাহিনি। "এ জেলার লোককাহিনীর

মধ্যে নেত রানীর হাস্তর, কৃষক ও জীন, বানর ও নাপিতের গল্প, দুই বন্ধু প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।"[২৩] লোককথা ও রূপকথা হচ্ছে আন্তর্জাতিকভাবে মানব সমাজে বিদ্যমান লোকসাহিত্যের সবচেয়ে সমৃদ্ধ শাখা।

খ. কিংবদন্তি বা সাংস্কৃতিক বিশ্বাস: পঞ্চগড় জেলার বিশালায়তনের অসংখ্য পুকুর-দিঘির অস্তিত্বের পেছনে নানা কাহিনি ও কিংবদন্তি রয়েছে যা এ অঞ্চলের মানুষের দৈনন্দিন জীবনাচরণে ধারণ করেছে বহুবিধ সাংস্কৃতিক বিশ্বাস বা লোকবিশ্বাস। "প্রাচীন পুকুরগুলোর মধ্যে মহারাজা দিঘি, ময়দান দিঘি, সুন্দর দিঘি, কাজল দিঘি, কালপির দিঘি, ভীমপুকুরী, কৈগেলা দিঘি, নয়া দিঘি, বড় দিঘি, মনোহর দিঘি, ভীমপুকুরী, কোয়েল দিঘি, শালবাহান দিঘি, দেবনগর দিঘি, ঝলঝলি দিঘি, সিপাই দিঘি ইত্যাদি সর্বজনবিদিত।"[২৪] এসব পুকুরের নামকরণে রয়েছে নানাবিধ কল্পকাহিনি ও কিংবদন্তি, যা আজোবধি লোক পরম্পরায় প্রচলিত হয়ে আসছে।

গ. লোকধর্ম: বাংলাদেশের ফোকলোর চর্চার ইতিবৃত্তে লোকধর্ম সম্পর্কে এক ভিন্ন ধারণা পাওয়া যায়। ঐতিহ্যনির্ভর লোকধর্ম, জাতি-গোত্র-বর্ণ নির্বিশেষে কেবল মানবতার জয়গান করে। "পরিবর্তন ও যুগের সাথে খাপ খাওয়ানোর উপযোগিতাতেই যেন লোকধর্মের প্রাণ সঞ্চারণ।"[২৫] পঞ্চগড় জেলায় লোককাহিনীর পাশাপাশি লোকপুরাণ বেশ জনপ্রিয়। এ অঞ্চলে লৌকিক পীর ও লৌকিক দেব-দেবীর আরাধনা বেশ প্রাচীন। লৌকিক পীর ও লৌকিক দেব-দেবীর আরাধনার অন্যতম প্রধান দিক হল, সকল ধর্মের মানুষের মিলন ঘটে এ জায়গায়, যেখানে ধর্মীয় পরিচয়ের ঊর্ধ্বে মানুষ হিসেবে পরিচয় মেলে। পঞ্চগড় জেলার লৌকিক পীরদের মধ্যে রয়েছেন- পাঁচপীর, সত্যপীর, খোয়াজ পীর, চিল পীর, ঢেল পীর, মাদার পীর, চুন খাওয়া পীর, মানিক পীর, কালু পীর, কাউয়া পীর, গাজী পীর, সোনা পীর প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন নির্জন প্রান্তরে পীরদের মাজার অবস্থিত, সেখানে অসংখ্য ভক্তকুল নিয়মিত ওরস ও মিলাদের আয়োজন করে থাকে। "লৌকিক পীরগণের বিশ্বাস যে তারা একইসাথে ব্যক্তি বিশেষে, প্রতীক হিসেবে আত্মারূপে মানব মনে সদা জাগ্রত।"[২৬] এছাড়াও, পীরানি হিসেবে এ অঞ্চলে যেসব নাম অগ্রগণ্য তাঁদেও মধ্যে- "বনবিবি, ওলাবিবি, বাংধীপীর, বুড়িপীর, কানীপীর, বিবিনুর, বিবিসাহেবানী, বেকীপীর উল্লেখযোগ্য। লাঠি হচ্ছে- গাজীপীরের, 'বাঁশ' মাদারপীরের, অপরদিকে 'পাট' হচ্ছে সত্যপীরের নিশান।"[২৭]

ঘ. লৌকিক দেব-দেবী: পঞ্চগড় জেলায় লৌকিক দেব-দেবীর যে চর্চা রয়েছে তার উদ্ভব বৈদিক ও পৌরাণিক ধর্মের পূর্ববর্তী আদিম সমাজে। বৈদিকদের ধর্ম সাধনার মূল পন্থা ছিল তন্ত্র বা যজ্ঞ। তবে বর্তমানে বৈদিক বা পৌরাণিক দেবতাদের পূজার পাশাপাশি পালিত হয় অসংখ্য লোকায়ত দেব-দেবীর পূজা পার্বণ ও ব্রত্যানুষ্ঠান। এ জেলায় "লৌকিক দেব-দেবীর মধ্যে কানী বিষহরি বা কান্দনী বিষহরা, হনুমান ঠাকুর, সন্ন্যাসী ঠাকুর, গোঙ্গা ঠাকুর, গ্যারাম ঠাকুর, ভেদাই ঠাকুর, বুড়া ঠাকুর, বুড়ি ঠাকুর, মেচেনী তিস্তাবুড়ি, বুড়া ধেল্লা, বারলিয়া, ভুঁইরাজা, মাশাণ কালী,

মাশান দেও, মেথেনী দেও, ভদ্র কালী, শ্যামা কালী, শ্মশান কালী, কাচাখুই কালী, হাদাং কালী, শীতলা, বাসন্তী, বিষহরি, সোনা রায়, গোরখনাথ, শলশিরি দেবী, গঙ্গা দেবী প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।”[২৮] মানুষ সরল জীবনযাপনের মধ্যে লৌকিক দেব-দেবীর আরাধনায় জীবনের মর্ম খোঁজার চেষ্টা করে। “এ জেলার লৌকিক পীর ও দেব-দেবীদের পূজায় যেসব জিনিস অপরিহার্য তার মধ্যে মোমবাতি, আগরবাতি, ধূপ, জিলাপি, নিমকি, বাতাসা, দুধ, দই, ক্ষীর, খৈ, মুড়ি, বাসনা চাল বা আতপ চাল, ধান, মুরগী, হাঁস, পাঁঠা, কবুতর, ছাগলের বাচ্চাসহ আরো বেশ কিছু উপকরণ। ভক্তদের ডাকে পীর বা দেব-দেবীগণ বিপদে পাশে দাঁড়ান এই বিশ্বাস থেকেই তাদের আরাধনা।”[২৯]

ঙ. লোকছড়াঃ লোকসাহিত্যের প্রাচীনতম সাহিত্য নিদর্শনসমূহের মধ্যে ছড়া অন্যতম। লৌকিক ছড়াসাহিত্য শিশু-কিশোর, তরুণ যুবক, বয়স্ক সকল শ্রেণীর জন্য রচিত। পঞ্চগড় জেলার লোকছড়ায় রয়েছে শিশুমনের চরম অভিব্যক্তি, শিশুদের খেলার ছড়া, সমাজের নানা অসঙ্গতি ও বাস্তব জীবনের প্রতিচ্ছবি। “লোকছড়ার সৃষ্টি, বিকাশ, ধারক-বাহক পল্লী বাংলার নারীসমাজ। এ অঞ্চলে যে ব্যক্তি কথায় কথায় ছড়ার অবতারণা করে ‘ফোকোটিয়া’ বা ‘ফকরা’ বলে অভিহিত করা হয়।”[৩০]

পঞ্চগড় জেলায় প্রচলিত কয়েকটি লোকছড়া দেয়া হলো–

(১)
“আয়রে পানি দিরদিরায়
শিদল দিনু গড়গড়ায়
পানি আসিল ঝিকে
পানি আসিল দোললে
শিদল গেল গললে। (ঐ)
(দিরদিরায়- ঝরঝর করে, ঝিকে- ঝমঝম করে)”[৩১]

(২)
“হায় আল্লা হযরত
মাইয়া মারছে মরদক।
মারিতে মারিতে নেগাইল
ওগে বুঝান খাটেরও তলত
(মাইয়া-মহিলা/বউ, মরদক- স্বামীকে, নেগাইল- নিয়ে গেল, তলত- নিচে)”[৩২]

(৩)

“শিশুদের ছড়া

ভাঙ্গা একখান টিনের গাড়ি
দিল্লী যাবো তাড়াতড়ি
ও ভাই তুই বাঙ্গালি
পাটি মাছের কাঙ্গালি
খৈলশা মাছের লোকাচোকা
ফুল ফুটেছে থোকা থোকা
ফুলে আগাল ধরি
দশ জনকার বাড়ি।”[৩৩]

চ. লোকধাঁধা: লোকসাহিত্যের একটি অন্যতম প্রাচীন ও স্বতন্ত্র শাখা হলো ধাঁধা। “পঞ্চগড় জেলায় হুদমা দেও-এর পূজাচারের ও বিয়ের অনুষ্ঠানের সময় ধাঁধা জিজ্ঞেস করার রীতি বহুল প্রচলিত।”[৩৪] আমাদের গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থায় নর-নারী, প্রকৃতি, গার্হস্থ্য জীবন, পশুপাখি, কাহিনী, সংখ্যা ইত্যাদি বিষয়ে ধাঁধা জিজ্ঞেস করার নিয়ম বেশ প্রচলিত এবং প্রশ্ন পদ্ধতির ভিত্তিতে বুদ্ধি, কল্পনা, কৌতূহল, রসবোধ মিলে ধাঁধায় একটি শিল্পীত মনের ছাপ ফুটিয়ে তোলা হয়ে থাকে। “ধাঁধা লোকায়ত জনপদে বুদ্ধি, মনন, মেধা ও জীবন দর্শনের ঐতিহ্যবাহী ভান্ডার হিসেবে বিবেচিত। আমাদের দেশে দীর্ঘদিন হতে ধাঁধা চর্চা হয়ে চলেছে মূলত বিবাহ উপলক্ষে বর ও কনের উপস্থিত জ্ঞান নির্ণয়ে, বিয়ে বাড়িতে বর ও কনে পক্ষের মধ্যে আমোদ-প্রমোদের অভিপ্রায়ে, গ্রামের তরুণ-তরুণীদের মধ্যে অবসর সময় অতিবাহিত করার মাধ্যম হিসেবে, এমনকি অক্ষরজ্ঞান শিক্ষামূলক এবং তা কখনো কখনো গৃহস্থালি কাজ-কর্মের মধ্যেই বিনোদনের অন্যতম মাধ্যমরুপে।”[৩৫] পঞ্চগড় জেলার বিভিন্ন স্থানে এসকল সামাজিক অনুষ্ঠানাদি ও গৃহস্থালি কাজকর্মের অবসরে ধাঁধা চর্চা বেশ প্রচলিত।

ছ. লোকপ্রবাদ: প্রবাদ সাহিত্যের মধ্যে একটি জাতির চিন্তার গভীরতা সম্পর্কে ধারণা লাভ করা সম্ভব। এছাড়া, “শিল্পচেতনা ও জীবন ব্যাখ্যায় প্রবাদ-প্রচলনগুলো সমাজ ও সমাজে বসবাসকারী মানুষের শিল্পবেদনাকে গভীর অন্তর্দৃষ্টির মধ্যদিয়ে উপস্থাপন করে থাকে।”[৩৬] গ্রাম-বাংলায় প্রচলিত প্রবাদ-প্রবচন লোকজীবনে একাধারে চিত্তবিনোদনের খোরাক, আর এটি লোকশিক্ষা ও জ্ঞানের অন্যতম বাহনরূপে কাজ করে থাকে।[৩৭] পঞ্চগড় জেলার লোকসংস্কৃতির মধ্যে প্রবাদ-প্রবচন বেশ সমৃদ্ধ। আজো এ অঞ্চলের বয়স্ক ব্যক্তি ও নারীদের মধ্যে প্রবাদ-প্রবচনের প্রচলন দেখতে পাওয়া যায়। “মিশরে আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব পাঁচশত অব্দে প্যাপিরাসে লিখিত গল্পে প্রবাদের উল্লেখ রয়েছে বলে ঐতিহাসিকদেও ধারণা। প্রবাদে প্রতিফলিত বিচিত্র বিষয়ের মধ্যে স্বাস্থ্যবিষয়ক, কৃষি বিষয়ক বা এ

ধরণের কিছু সংখ্যক প্রবাদের কোন অতিরিক্ত প্রকাশভঙ্গি না থাকলেও প্রবাদের মূল লক্ষ্য মানব চরিত্র রূপায়নের বিশ্লেষণধর্মী বহি:প্রকাশ।"[৩৮] প্রবাদের চর্চার ভিতর দিয়ে মানুষের ভাবের গভীরতা বৃদ্ধি পায়। শাণিত হয় বিবেক ও বুদ্দিমত্তা। "জ্ঞানের গভীরতা নির্ণয়, ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা রক্ষা, অভিজ্ঞতার বহি:প্রকাশ এবং বক্তব্যের সংক্ষিপ্ততা প্রবাদের অলংকার হিসেবে এর অবেদন আজ অবধি অটুট।"[৩৯] এসব প্রবাদ-প্রবচনে মানুষের মন্দ দিকগুলো সমালোচনা করা হয়ে থাকে। যেমন- 'কেরাসিনের গন্ধ নাই, নাম থুইছে আতর আলী' (নামের সাথে কাজের অন্তমিল নেই)। আবার, গ্রামের অলস অক্ষম ব্যক্তির সম্পর্কে প্রবাদ-প্রবচনে বলা হয়েছে- 'কটিত নাই হেরা, বান্ধিবা যাছে ঘেরা' (যার পড়নে কাপড় হৈন, সে যায় বেড়া বাঁধতে)। এ অঞ্চলের প্রবাদ-প্রবচনে সতীন সম্পর্কে নারীর চিন্তা-ভাবনায় রয়েছে ভিন্নতা। "যেমন- 'দুই সতীনের ঘরে, ভাতার উল্টে পড়ে'। এছাড়া কৃষি সম্পর্কিত প্রবচনে বলা হয়েছে, 'অঘন পোষে বিষ্টি, আম-কঠলের সিষ্টি', 'কার বেটির কেনং ঢং দেখা যাবে দেবীর বাজারত'।"[৪০]

জ. লোকস্থাপত্য: পঞ্চগড় জেলার লোকস্থাপত্যে রয়েছে নান্দনিকতার বহিঃপ্রকাশ। পঞ্চগড় জেলায় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন শাসকগোষ্ঠীর দ্বারা নির্মিত হয়েছে অনেক প্রত্নতাত্ত্বিক স্থাপনা। এই অঞ্চলে প্রাচীনকাল থেকে খড়ের ছাউনি ও বাঁশের বেড়া দিয়ে তৈরি ঘরবাড়িতে বসবাসের রীতি বেশ প্রচলিত। প্রাচীনকাল থেকেই এ অঞ্চলের লোকজন জঙ্গলময় পরিবেশে বসবাস করতো। বাড়ি-ঘর ছিল বিভিন্ন প্রজাতির বাঁশের ঝোঁপ-ঝাড়ে ঘেরা। "এ জেলার বসত বাড়ির মধ্যে পোয়াল বা দুইচালা খেড়ের ঘর, চৌচালা বা চুয়াড়ি ঘর, 'ডেরিয়া' বা বৈঠকখানা ঘর (আট চালাবিশিষ্ট), জোড় বাংলা ঘর (দুটি দোচালা বিশিষ্ট ঘর), মাচাং ঘর, মাটির ঘর, দোচালা টিনের ঘর, চার চালা টিনের ঘর, ছটি ঘর বা আঁতুর ঘর, ঠাকুর ঘর, গোলা ঘর (ধান, চাল রাখার ঘর) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।"[৪১]

ঝ. লোকসঙ্গীত: পঞ্চগড় জেলার লোকসঙ্গীতের রয়েছে সমৃদ্ধ ইতিহাস ও ঐতিহ্য। এ অঞ্চলের লোকসংগীত 'হেরোয়া' বা মেয়েলি গীতের পরিবেশনার সময় কোন প্রকারের বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার হয় না। এই অঞ্চলের লোকংগীতে প্রতিফলিত হয়েছে গ্রামীণ লোকজনের প্রাত্যহিক জীবনের প্রতিচ্ছবি। এ জেলার প্রচলিত লোকসংগীতের মধ্যে হুলির গান, হেরোয়া বা বিয়ের গীত, ভাওয়াইয়া, তিস্তা বুড়ির গান, কান্দনি বিষহরির গান, বৃষ্টির গান, হুদুমা দেও- এর গান, যুগীর গান, মানিক পীরের গান, সোনা পীরের গান, মাগনের গান, সত্যপীরের গান, বাবা লোকনাথের গান, রাখালিয়া গান, কোয়াল গান, চোর-চুন্নির গান, চটকা গান, গাজির গান, জারি গান, ছাদ পেটানোর গান বা কর্মসঙ্গীত, মারফতি, মুর্শিদি গান, মাহফিলের গান বা ভাব-বিচেছদ গান প্রভৃতি বেশ জনপ্রিয়। তবে, "এ অঞ্চলের লোকসংগীতে প্রাচীন গোপীচন্দ্র ও মানিক চন্দ্রের গান, বৌদ্ধ সহজিয়া এবং মধ্যযুগের

বৈষ্ণব মতের গভীর প্রভাব রয়েছে। উত্তরবঙ্গের ভাওয়াইয়া জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, রংপুর ও দিনাজপুর অঞ্চলের অন্যতম প্রধান লোকসংগীত হিসেবে বেশ সমাদৃত এবং এর আদি উৎপত্তি স্থল হিমালয়ের পাদদেশীয় তরাই অঞ্চলে।”[৪২]

ঞ. লোকবাদ্য: পঞ্চগড় জেলার লোকবাদ্য যন্ত্রের মধ্যেও আমরা লক্ষ্য করি ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা। এ জেলার লোকবাদ্যযন্ত্রের মধ্যে রয়েছে বাঁশের বাঁশি, পাতার বাঁশি, জুরি, ঢোল, খমক, কাঁশর বা কাঁশি, সারিন্দা, খঞ্জনি, ভেঁপু, ঘুঙুর, করতাল, মন্দিরা, ডুগডুগি, বাঁশের বাঁতা ও প্লাস্টিকের বয়মের তৈতি একতারা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তবে বর্তমানে পশ্চিমা বাদ্যযন্ত্রের প্রভাবে লোকবাদ্য দিন দিন হারিয়ে যাবার পথে।

ট. লোকনাট্য: লোকনাট্য পঞ্চগড় জেলার লোকসংস্কৃতিতে অন্যতম জায়গা দখল করে রয়েছে। লোকনাট্যের বিষযবস্তু হিসেবে বর্তমানে সমাজের নানা অসঙ্গতি ফুটিয়ে তোলা হয়ে থাকে। উন্মুক্ত স্থানে পরিবেশিত এসব লোকনাট্যের মধ্যে জনপ্রিয় হচ্ছে হুলির গান, মফিজুল ফাতেরারগান, বিষহরা গান, সইত্যপীরের বা সত্যপীরের গান প্রভৃতি লোকনাটক আজো তার আবেদন ধরে রেখেছে। এ জেলার লোকনাট্যের মধ্যে হুলির গান নামে যে জনপ্রিয় লোকনাট্য ও লোকগান প্রচলিত রয়েছে তা মূলত ধর্মীয় বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত। বর্তমানে হুলির গানের বিষয়বস্তুতে সমকালীন সমাজের চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়ে থাকে। “লোকনাট্য লোকসমাজনির্ভর এক জনপ্রিয় শিল্পমাধ্যম।”[৪৩] দেশের অন্যান্য এলাকার লোকনাটকের ন্যায় এ অঞ্চলের লোকনাটক সংগীতকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। “লোকনাট্যের উদ্ভব স্তরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে প্রকৃতি, জীব-জন্তু, শিকার প্রবৃত্তি, ফসল উৎপাদন, বৃক্ষের সহজ বৃদ্ধি, ফল উৎপাদনসহ নানা প্রক্রিয়া এবং অভিনেতা, কলা-কুশলী, শ্রোতা-দর্শক, গীতক-বাদক সবাই লোকসমাজ হতে সৃষ্ট।”[৪৪] এ অঞ্চলের লোকনাটকে ভাড় বা জোকার চরিত্র নাটকের একটি অন্যতম আকর্ষণ। যার সাহসিকতা, বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি, চালাকি, বোকামি ব্যাপক আকর্ষণ তৈরি করতে সক্ষম হয়। এ অঞ্চলের লোকনাটকের জন্য গোল বা চারকোনা মঞ্চ তৈরি করা হয় এবং তার উপর ছনের, খড়ের বা কাপড়ের আচ্ছাদন থাকতে পারে, এমনকি নাও থাকতে পারে। মঞ্চের মাঝখানে কিছুটা অংশ ফাঁকা রেখে অভিনয় শিল্পিরা প্রথমে গোল হয়ে বসেন যার চতুর্পাশেই থাকে দর্শকের অবস্থান। নাট্যগীতি পরিবেশনের সময় তারা একতারা, বাঁশি, করতাল, মাঝারি আকারের ঢোল সংগীতের বিষয় অনুযায়ী সংগত করা হয়। বর্তমানে কিবোর্ড, প্যাড এসব পশ্চিমা বাদ্যযন্ত্র লোকনাট্যের সাথে কিছুক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। পঞ্চগড় জেলার লোকনাটক দেশের অন্যান্য অঞ্চলের লোকনাটকের মতোই হাটবাজারের এককোণে, স্কুলের মাঠে বা বড় কোনো গাছ তলায় কিংবা মন্দিরের মাঠে আয়োজন করা হয়ে থাকে। যদিও সাম্প্রতিককালে শহরেও বিভিন্ন লোকনাটক পরিবেশন করা হচ্ছে।

ঠ. লোকনৃত্য: লোকসংস্কৃতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ লোকনৃত্য। মূলত লোকনৃত্য একটি দলীয় উপস্থাপনা এবং এটি সহজ, স্বতঃস্ফূর্ত ও কৃত্রিমতা বর্জিত হওয়ায় জনমনে সহজেই আনন্দের সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। এছাড়াও বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাপদে ডোম নারীর চৌষট্টি পাপড়ি বিশিষ্ট পদ্মের উপর নৃত্যের নজির মেলে। বাংলাদেশে প্রচলিত জনপ্রিয় লোকনৃত্যের মধ্যে ধামাইল নৃত্য, গম্ভীরা নৃত্য, ঘাটু নৃত্য, জারি ও সারি নাচ, ঝুমুর নৃত্য দেশের বিবিন্ন অঞ্চলে পরিবেশিত হয়। "পঞ্চগড় জেলার ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে পরিবেশিত লোকনৃত্যের মধ্যে গমীরা, বিষহরা নৃত্য, ভেদাই নৃত্য, হুদমা দেও-এর নৃত্য, টোকা খেলার নৃত্য, বদনা বিয়ের চক্রাকারে নৃত্য, জলেশ্বরী নৃত্য, মহরমের জারি বা লাঠি নাচ, মাদারের নাচ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও বিভিন্ন উৎসবকেন্দ্রিক নৃত্যের মধ্যে রয়েছে- ছোকরা নাচ, খেমটা নাচ, কালী নাচ, বৈরাগীর নাচ, শিবের নাচ, লাঠি নাচ, বলি নাচ, আরতী নৃত্য, ভান্ডির নাচ প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।"[৪৫]

ড. লোকউৎসব: দেশের অন্যান্য জেলার মত পঞ্চগড় জেলাতেও ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় পালিত হয়ে আসছে বিভিন্ন উৎসব। "লোকউৎসব সমাজের নানা বিশ্বাস-সংস্কারের মধ্যে নিহিত, আচার-অনুষ্ঠানে সংহত, নানা পরিবর্তনের মধ্যদিয়ে উৎসারিত। লোকউৎসব সমাজের মানুষের কল্যাণে সুদীর্ঘকাল হতে বহমান।"[৪৬] এসব উৎসব ও আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে নববর্ষ বা বৈশাখী উৎসব, নবান্ন, ঈদ উৎসব, মহররম, চড়ক উৎসব প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

ঢ. লোকমেলা: আমাদের দেশে শাস্ত্রীয় ও ধর্মীয় আচার অবলম্বন করেই মেলার সূচনা হয়েছে বলে পণ্ডিতগণের ধারণা। এদেশে ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় পালিত হয়ে আসছে বিভিন্ন ধরনের লোকমেলা। এসব লোকমেলার মধ্যে ধর্মীয় উৎসবকেন্দ্রিক মেলা, ঋতুকেন্দ্রিক মেলা, বাৎসরিক মেলা, পাখির মেলা, চৈত্র-সংক্রান্তির মেলা, জন্মদিন পালন উপলক্ষে মেলা, কৃষি উন্নয়ন মেলা, বিভিন্ন দিবস ভিত্তিক মেলা ও বাণিজ্যি মেলার মধ্যদিয়ে দেশীয় সংস্কৃতির ব্যাপক বহি:প্রকাশ ঘটে। লোকমেলায় ক্রয়-বিক্রয়ের পাশাপাশি লোকজনের বিশাল মিলনমেলায় পরিণত হয়। "পঞ্চগড় জেলায় যেসব মেলা পালিত হয়ে আসছে তার মধ্যে মহারাজার মেলা, আলোয়াখোয়া মেলা, বান্নীর মেলা, কালির মেলা, বারো আউলিয়ার মেলা, মাটির মেলা, দোল পূর্ণিমার মেলা, নূতন হাট বৈশাখী মেলা, আমলাহার বৈশাখী মেলা, পঞ্চগড় বৈশাখী মেলা, আটোয়ারীর মেলা, জান্নাহানির মেলা, দেবীগঞ্জের তিস্তা ঘাটের মেলা। মানুষের চিত্তবিনোদনের পাশাপাশি লোকমেলায় অনেকের আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়।"[৪৭] আর এ কারণেই লোকমেলা হয়ে উঠে সকলের জন্য মঙ্গলময়।

ণ. লোকাচার: বাংলাদেশের সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ লোকাচার। লোকাচার হল যোগ হতে যুগান্তরে কাল হতে কালান্তরে প্রচলিত সমাজ মানুষের সমন্বিত চিন্তার ফসল। "এদেশের লৌকিক আচার অনুসারে কাব্যবস্তু এবং অতিন্দ্রীয় শক্তির প্রতীকের উপস্থিতি ছাড়া সঠিকভাবে তা পালিত হয় না। এছাড়াও মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে ধান ও দূর্বাকে ঐশ্বর্য ও দীর্ঘ জীবনের প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করা হয়।"[৪৮] বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালায়, শাস্ত্রীয় বা ধর্মীয় সংস্কারভিত্তিক ও লৌকিক এই দুই ধরণের লোকাচারের কথা বলা হয়েছে। লৌকিক লোকাচার ও ধর্মীয় সংস্কারভিত্তিক লোকাচারে শুধু পার্থিব বা অপার্থিব কামনাই নয় বরং প্রাত্যাহিক জীবনে আরোগ্য কামনা, অভাব-অনটন হতে মুক্তি, জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ, বৃষ্টির আবাহন, দুষ্টের বিনাশ ও পারিবারিক শান্তি কামনায় পালিত হয়ে আসছে। পঞ্চগড় জেলায় প্রচলিত লোকাচারের মধ্যে গর্ভবতী মা'দের সাত খাওয়ানো (সাত প্রকারের মিষ্টান্ন), শিশুদে মুখে ভাত বা অন্নপ্রাশন, নাম রাখা ও আকিকা পালনের রীতি বেশ প্রচলিত। "এ অঞ্চলে বিবাহ সংক্রান্ত বিভিন্ন লোকাচারের মধ্যে পান-চিনি, গায়ে হলুদ, থুবরা কৌটা, বর স্নান, অধিবাস, আগ বারানি, বধূবরণ, কড়ি খেলা, আংটি খেলা, খইঞ্চা খাওয়া, বাসি গোসল, বৌভাত, আঠরা, কইনা-পাত্রের পথ ফিরানী প্রভৃতি বেশ জনপ্রিয়। এছাড়াও কোচ বা পলিয়া সমাজে বাল্য বিবাহ রীতি কে বলা হয় গৌরীদান। অপরদিকে, পঞ্চগড় জেলার তেঁতুলিয়া অঞ্চলে বসবাসকারী সাঁওতালদের বিয়ের দিন পাঁচটি কলাগাছ মাটির উঁচু বেদির মধ্যে পুঁতে রাখার যে রীতি প্রচলিত তাকে স্থানীয় ভাষায় 'মারোয়া' নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। মৃতব্যক্তি সম্পর্কিত হিন্দু আচারের মধ্যে অশৌচ পালন, হবিষ্যান্ন গ্রহণ এবং তিন ধরনের শ্রাদ্ধ লক্ষ্য করা। গবাদি পশু সংক্রান্ত লোকাচারের মধ্যে এ জেলায় প্যালিত হয়ে আসছে গরু বরণের রেওয়াজ, গরুর মঙ্গল কামনা, গরু চুমা, গাছের বিবাহরীতি, উকিল বাপ ধরম বাপ দায় নামক এরূপ নানা লোকাচার পালনের রীতি বহুল প্রচলিত।"[৪৯]

ত. লোক খাদ্যাভ্যাস: পঞ্চগড় জেলায় প্রচলিত খাদ্যাভ্যাসের একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে। জেলায় শাক-সবজি, মাছ-মাংস সহ সব ধরনের তরকারি শাক বলে অভিহিত করা হয়। প্রায় সকল রান্নায় ঝোল রাখার প্রবণতা দেখা যায়। এছাড়া, মজা গুয়া (সুপারি) এ অঞ্চলের জনপ্রিয় খাদ্য উপকরণ যা এ অঞ্চলের কাঁচা গুয়া ও সুপারি দুই নামেই পরিচিত। সকালবেলার আহারাদি হিসেবে এ জেলার লোকজনের মধ্যে খড়খড়া বা বাসি তেল ও মরিচে ভাজা বৌখুদা, মরিচ-পান্তা, খৈ ও মুড়ি, গুড়ের চায়ের সাথে মুড়ি খাওয়ার রীতি প্রচলিত। পিঠা হিসেবে এ অঞ্চলে চিতুয়া, ভাপা পিঠা, চালের গুড়ার রুটি ও গুড় দিয়ে চালের গুঁড়োর ক্ষীর বেশ জনপ্রিয়। "পঞ্চগড় জেলায় প্রচলিত খাদ্যের মধ্যে আমশির খাটা, মিষ্টি আলুর পাতা, কলমি শাক, কুমড়ার বিচ্চি (বিচি), কাঁচা কঠলের (কাঁঠাল) শাক, কঠলের মচ্কা মোচা), কঠলের বিচ্চি, কেলার মচকা(কলার মোচা), কালা কচু, সাদা কচু, মান কচু, কাঁচা কলার ভর্তা ও বড়া, কুমড়ো গাছের লতাপাতা, কচুর নেউল, কাকিরী শাক, কাউনের ভাত, কড়কড়া বা খড়খড়া

ভাত (রাতের বাসি শক্ত ভাত), খুদের ভাত বা বৌ-খুদা (চালের ভাঙ্গা ক্ষুদ্রাংশ), গাবথোর বা কলা গাছের ভিতরের মসৃণ অংশ, ঘিমা শাক, চিরামিরা শাক, চামঘাস এর ভর্তা, চুকা শাক, কচুর ছ্যাকা, টেমাটোল খাঁটা বা টমেটোর টক, ট্যাপেরাই শাক, ঠাকুরি কালাইর বড়া, ডাউয়া, ঢেমসির ভাত, ঢেমসির গুঁড়া, ঢেকীয়া শাক, দলঘড়িয়া শাক, দহিচুড়া, নিম পাতার ভাজি, প্যালকার ঝোল, ভুট্টা ও গমের ছাতু, শাপলা ফুলের শাক, পবা শাক, জলপাইয়ের খাটা, টেমাটোলের (টমেটো) খাটা ও চাটনি উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও পহেলা বৈশাখের খাবার হিসেবে ফক্তাই, ফড়ুয়া, পাতাকপি বা বাঁধাকপি-শুটকি, বাবড়ী শাক, বথুঁয়া শাক, ভোগদানের পায়েস, গোসতোর কষা পাক, মিষ্টি কুমড়ার ফুলের বড়া, মানা বা মান কচু, শাপলার ফুলের সাথে ডালের ঘন্ট, শপ শাক, সিঁদলের ভর্তা, রসুন পাতা কাঁচা মরিচের ভর্তা, পেঁয়াজ পাতার ভর্তা ও ভাজি, লেবুপাতার খাট্টা, লাফা শাক, বাঁশের টেঁকা বা মুখি দিয়ে হাঁসের তরকারি, প্যালকা শাক (বিভিন্ন শাক-সবজির পাতা দিয়ে তৈরি), খুরিয়া শাক, মানার শাক, শুক্তার শাক প্রভৃতি বেশ জনপ্রিয়।"[৫০]

থ. লোকজ পিঠা: পঞ্চগড় জেলায় লোকজ পিঠা খাওয়ায় কিছুটা বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। এ জেলায় পিঠা তৈরিতে বেশ বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। "প্রচলিত পিঠার মধ্যে কেলা বা কলা পিঠা, কঁঠল বা কাঁঠাল পিঠা, উট পিঠা বা ঝাল পিঠা, চাইর খোলা, আট খোলা, পকন পিঠা (তেলের পিঠা), খিলি পিঠা, গুলগুল্লা পিঠা, গুড়গুড়িয়া পিঠা, ছিটা পিঠা, চিতুয়া বা চিতই পিঠা, ছাঁচ পিঠা, সিরিঞ্জ পিঠা, ডিমা পিঠা, তাল পিঠা, চাউলের আটার পিঠা, নারিকেল কুলি (পুলি), দুধ কুলি (পুলি), পানি পিঠা, বড়া পিঠা, ভাকা পিঠা বা ভাপা পিঠা, দুধের পিঠা বা দুধ চিতই, অন্দশা পিঠা, নুনিয়া বা নুনুহাস পিঠা প্রভৃতি বেশ জনপ্রিয়।"[৫১] পিঠা তৈরির মধ্যদিয়ে গ্রামের শ্বাশ্বত নারীর শৈল্পিক বহিঃপ্রকাশ ঘটে। আমাদের সংস্কৃতিতে হাজার বছর ধরে পালিত বাঙালি ঐতিহ্য লোকজ পিঠা। পিঠা বানানো ও খাওয়ার ব্যাপক আয়োজন বাঙালির নিজস্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকেই তুলে ধরে।

দ. লোকক্রীড়া: সমাজের অনেক বিষয়ের প্রতিফলিত রূপ লোকক্রীড়া। এছাড়া, শিশুদের পুতুল পুতুল খেলা লৌকিক খেলাধূলার মধ্যে অত্যন্ত প্রিয়। আদিকাল থেকেই পুতুল শিশুদের বিনোদনের প্রধান মাধ্যম। চাঁপাইনবাবগঞ্জের লোকসংস্কৃতি গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, লৌকিক আগডুম বাগডুম খেলা সম্পর্কে ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য-এর মত হলো-'আগডুম' অর্থ অগ্রবর্তী ডোম সৈন্যদল, 'বাগডুম' পার্শ্ববর্তী ডোম সৈন্যদল এবং 'ঘোড়াডুম' অশ্বারোহী ডোম সৈন্যদল। এককালে ডোম সৈন্যই বাংলার পশ্চিম সীমান্ত রক্ষা করতো।[৫২] লোকক্রীড়া শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণ একে প্রাণবন্ত করে তুলেছে। পঞ্চগড় জেলায় প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত বিভিন্ন ধরনের খেলা লক্ষ্য করা যায়। এসব লোকজ খেলার মধ্যে "পুতুল খেলা, সুপারির খোল টানা খেলা, বাঘ বকরি, চৌপাতি খেলা,

চকচ্চাল, হাতত (হাতে) না কছাত, ইচিং বিচিং খেলা, কুতকুত খেলা, গাই বাছুর, এক-এ ইঁদুর, কুনঠে মুই কহদি, হাঁসাহাঁসি, লুকাটুহু, ছাগল দাড়ি, কিস কিস কিসের পাতা, এলাটিন বেলাটিন, ভেঁপু খেলা, বুড়ির বেটি কুনঠে যাছি, চোর পুলিশ খেলা, হিন্দু ধর্মালম্বীদে দধি কাদো, বিয়ারিং খেলা, সাঁতার কাটা, চোর-পুলিশ, হিন্দু-মুসলমান, কাঁঠাল খেলা, একশমনি একশমনি, পাইসা (পয়সা) খেলা, এক্কাদোক্কা, মার্বেল খেলা, হাড়িভাঙ্গা, পাখি খেলা, মাঝি খেলা, কুদ্দা কুদ্দি, কলাগাছে উঠা, সুই সুতা, কানামাছি, ছুয়াছুয়ি খেলা, পিঠিত গুড়ি খেলা, ছোট বউ, বাঘ শিয়াল খেলা, ছেলেদের পাখি খেলা প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।"[৫৩] লোকখেলা সমাজ বিবর্তনের মাধ্যমে বিকাশ লাভ করেছে। "সময়ের বিবর্তনে লোকজ অনেক খেলা হারিয়ে যায়, আবার কোন কোন খেলার নব্য প্রচলন ঘটে। আর এভাবে বিলুপ্তি ও সংযুক্তির মধ্য দিয়ে লোককেলা এ দেশের মানুষের সত্তার সঙ্গে মিশে রয়েছে।"[৫৪]

দ.১. মহররম ও টোপ খেলাঃ

ইসলামের ইতিহাসের ইমাম হোসেনের শহীদ হওয়ার ধর্মীয় ঘটনা লৌকিকভাবে পল্লীসমাজে তার যে তাৎপর্য, মনের বাসনা পূরণের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে মহররমের আগমন তার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আরবি মহররম মাসের ৪/৯/১০ তারিখ রাতের বেলা সকিনা বিবির বিবাহ প্রদান উপলক্ষ্যে মহররমের লোকজ আনুষ্ঠানিকতা শুরুর প্রচলন পঞ্চগড় জেলায় লক্ষ্য করা যায়। সকিনা বিবির বিয়ে উপলক্ষ্যে কয়েকজন মহিলার হেরোয়ার ঢঙে সুরযোগে গান পরিবেশনের রীতি রয়েছে। "মহররমের মাসে লৌকিক আচার হিসেবে পঞ্চগড় জেলার বিভিন্ন স্থানে 'লাঠিখেলা' বা 'গোল' খেলা, মানত উপলক্ষে 'টোকা' খেলার বেশ প্রচলন রয়েছে।"[৫৫]

ধ. লোকচিকিৎসাঃ অলৌকিক ও অদৃশ্য শক্তির উপর অগাধ বিশ্বাস আদিকাল থেকেই মানুষের মনে বিশেষ স্থান দখল করে রেখেছে। তথ্যপ্রযুক্তির বর্তমান বিশ্বেও প্রাকৃতিক গাছগাছালির ওষুধের ওপর সাধারণ মানুষের আস্থা ও অগাধ বিশ্বাস এখনো সেই ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় বিদ্যমান। আমাদের লোকসমাজে অলৌকিক শক্তির অধিকারীগণ বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা দিয়ে থাকেন। "যেসকল রোগের প্রাকৃতিক চিকিৎসা করা হয় তার মধ্যে কুকুর কামরানো, সাপে কাটা জলে ডুবা, ভূতে ধরা, ছানি পড়া, বুকের কড়ি পড়া, শরীরের ব্যথা, গুড়া কৃমি, রক্ত আমাশয়, মেহ রোগ, আধ কপালি বিষ বা ব্যথা, আন্ধাশুলা বা রাতকানা, পেট ব্যাথা প্রভৃতি ছাড়াও আরো নানান রোগের মুক্তি কামনায় কবিরাজি ও ঝাড়ফুকের মতো লোকচিকিৎসা আজো কেবল বিশ্বাসের উপর ভর করে অটুট রয়েছে।"[৫৬]

ন. লোকনাম: প্রকৃত নাম লোকনামের আড়ালে কখন যেন হারিয়ে যায়। তখন আসল নামে খোঁজ করলেও সেই মানুষটিকে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। পঞ্চগড় জেলায় বেশ কিছু লোক নামের মধ্যে– শুকুরু (শুক্রবার জন্ম), সমারু সোমবার জন্ম), মঙ্গলু (মঙ্গলবার জন্ম), বুধারু (বুধবার জন্ম), কালুয়া (কালো বলে), সাদা মাগুর (বেশি উজ্জল), পোহাতু (প্রভাতে জন্ম), খেতখেতু, বুয়ালু, বাগেনা, ভেগদল, ধরফরু, ধাগুরন, ধোমপোশ, ছুবাউ (ছোট বাবু), বাচ্চা বাউ, নুনু বাউ (ছোট ছেলে), দিনকাটু, মটা ছুবা, অঘণী (অগ্রহায়ণে জন্ম), ফাল্গুনী, চৈতালী, বৈশাখী প্রভৃতি নাম উল্লেখযোগ্য। "মানুষের নাম প্রসঙ্গে 'নকশী কাঁথার মাঠ' কাব্যে জসীমউদ্দিন 'বড়ু' নামটি লোকনাম হিসেবে ব্যবহার করেছেন। যে কোন সমাজেই লোকনামের প্রভাবে প্রকৃত নাম লুকায়িত থাকে।"[৫৭]

প. লোকমন্ত্র: মন্ত্র বা যাদুবিদ্যার উদ্ভব ও বিকাশ প্রাচীনকাল হতে। প্রাচীন সমাজে ধর্ম নয় বরং যাদু বা মন্ত্র বা অলৌকিক শক্তির উপর ছিল অগাধ বিশ্বাস। পার্শ্ববর্তী বন্ধুরাষ্ট্র ভারতের জলপাইগুড়ি, কোচবিহার জেলা, বাংলাদেশের রংপুর, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও এবং পঞ্চগড় জেলার প্রত্যন্ত গ্রামে বর্তমানকালেও ডাক্তার কবিরাজের তুলনায় মন্ত্রজ্ঞ ব্যক্তির কদর কিছুক্ষেত্রে অনেক বেশি। "মধ্যযুগের কোচ রমণীদের যাদুবিদ্যায় পারদর্শী বলে মনে করা হতো। এদেশের সমাজ ব্যবস্থায় গ্রামীণ মানুষের পাশাপাশি উচ্চ শিক্ষিত মানুষের অলৌকিক শক্তি বা মন্ত্রের প্রতি রয়েছে দৃঢ় বিশ্বাস।"[৫৮] বাংলার লোকসমাজে মন্ত্রে বিশ্বাস সুদীর্ঘকালের। মন্ত্র বা যাদুবিদ্যাকে আদিম মানব সমাজের বিজ্ঞানের সাথে তুলনা করা হয়েছে। যাদুবিদ্যা হিসেবে মন্ত্র পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের মানুষের জীবনে এ অলৌকিক সত্তা হিসেবে মিশে রয়েছে। "তন্ত্র-মন্ত্র দ্বারা যে সকল রোগ নিরামতার মধ্যে পেটের ব্যথা নিরাময়ের মন্ত্র, পায়ে বা বগলে ফোড়া নিরাময়ের মন্ত্র, বাতের ব্যাথার মন্ত্র, অজ্ঞান হয়ে পড়ার মন্ত্র, ধানের পোকা তাড়ানোর মন্ত্র, মুরগি জবাই করার মন্ত্র, গোমা সাপ ধরার মন্ত্র, ভাঙ্গা মচকা ভালো করার মন্ত্র, মেয়ে ভুলানো মন্ত্র, হাত চালুর মন্ত্র, জল বা গুঁটি বসন্ত রোগ নিরাময়ের মন্ত্র, গরু ছাগলের নাভিতে পোকা তাড়ানোর মন্ত্র প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।"[৫৯] এছাড়াও এ অঞ্চলের শরীর বন্ধের মন্ত্র বেশ জনপ্রিয়। এ জেলার শরীর বন্ধের মন্ত্রের নমুনা হলোঃ

"কিষ্টা কিষ্টি কুকুর ডাকে
কালীমাই মস্তকে চড়ে
ডাহিনে আল্লা বামে ধুত
এই দেহা মন করেছু
এই কালিকার পুত।
চড়াবো ঘাও
দোহাই লাগে শিব চণ্ডীর মাথাথ
মুছিব দুই পাও।"[৬০]

পঞ্চগড় জেলায় পেটের ব্যথা নিরাময়ের মন্ত্র নিম্নরূপঃ

"হুক ঝাড় হুঁকানী ঝাড়
তিন কম পৃথিবী ঝাড়,
হুকের বুকেতে মারিনু গুড়ি
হুক গেল বৈকুন্ঠপুরী।"[৬১]

ফ. লোকপোশাক: দেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতো পঞ্চগড় জেলার লোকপোশাকে স্বকীয় রয়েছে বৈশিষ্ট্য। প্রাচীনকাল থেকে বিংশ শতাব্দির প্রথম দশক অবধি এ অঞ্চলে সেলাই ছাড়া কাপড় পরিধানের রীতি প্রচলিত ছিল। পুরুষেরা লম্বা বাবরী চুল রাখত। পায়ের জুতা ব্যবহারের প্রচলন তেমন একটা ছিল না বললেই চলে। সমাজের বিত্তবান লোকেরাও পড়তেন কাঠের খড়ম, আর নারীরা ব্যবহার করতেন না বলেই জানা যায়। গত শতকের চল্লিশের দশক পর্যন্ত হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলেই ধুতি ও বুকে বোতাম যত যুক্ত জামা পরিধান করতেন, বড় বড় পকেটযুক্ত ফতুয়ার প্রচলন ছিল। "এ অঞ্চলে বসবাসরত রাজবংশী, পলিয়া, কোচরা শরীর ঢাকতে ব্যবহার করতেন নেংটি। নারীরা শরীর ঢাকতেন ফোতা বা বুকুনি দিয়ে। শরীরের অনেকাংশ থাকতো অনাবৃত। গামছার ব্যবহার ছিল ব্যাপক। মেয়েরা পড়তেন মোটা এক রঙের শাড়ি। ব্লাউজ বা অন্তর্বাসের প্রচলন ছিল না, তবে অবস্থাসম্পন্ন হিন্দু-মুসলিম মহিলাদের ব্লাউজ ব্যবহারের সামান্য প্রচলন ছিল বলে জানা যায়। অলংকার হিসেবে স্বর্ণের খুব একটা ছিলনা বললেই চলে। নাকের নোলক, তাবিজ, হাঁসুলি হার, কোমরের বিছা, মাকড়ি, খোঁপার কাঁটা, খাড়ু, পায়ের মল, সিঁথি পাটি, ঝুমকা, নাকের ফুল, চুড়ি, নথ, নূপুর ইত্যাদি লোকঅলংকার হিসেবে বেশিরভাগ নারীই ব্যবহার করতেন।"[৬২]

ব. লোকশিল্প: পঞ্চগড় জেলায় লোকশিল্পের নিদর্শন ছড়িয়ে আছে বাঁশ, বেত, পাট, মাটি ও কাপড়ে তৈরি নানা উপকরণের মধ্যে। এ জেলায় কামার, কুমার, ছুতার, ঘরামি, তাঁতি, সোনারু, কাঁসারি প্রভৃতি পেশাজীবী তাদের সৃষ্টির পথ আকীর্ণ করে না রেখে বরং বংশ ও ঐতিহ্য পরম্পরায় মৃৎশিল্প, দারুশিল্প, পাটজাত শিল্প, বাঁশ ও বেতের তৈরি শিল্প, সুঁচিশিল্প, শোলা শিল্প ইত্যাদি লোকশিল্পে অবদান রেখে চলেছেন। পঞ্চগড়ের লোকশিল্পের মধ্যে মৃৎশিল্পের একটি বৃহৎ ক্ষেত্র লক্ষ্য করা যায়। "মৃৎশিল্পগুলোর মধ্যে বিভিন্ন ঠাকুরের পট ও দেব-দেবীর ছোট মূর্তি, খেলনা পুতুল ও মানুষের ঘোড়া-হাতি, বিয়য়ে অনুষ্ঠানের পেঁচি ও চুনাতি, কুপি বা প্রদীপ, ঢেঁকি, টকা, তাড়ি (পাত্র), ঢাকন বা ঢাকনা, চারখুটিয়া, হুক্কার ছিলিম, পূজার প্রদীপ, পঞ্চ প্রদীপ, গাঁজার প্রদীপ, ঘট, সরা,

আদিসরা, সুরাহি, মনসার পট, মাটির লক্ষী, মহামারী ঠাকুরের পট, পোড়ামাটির হাতি ও ঘোড়া, কলস ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।”৬৩

বাংলাদেশের মৃৎশিল্পের ইতিহাস সুপ্রাচীনকালের। “ধারণা করা হয়, মধ্যপ্রাচ্যেই সর্বপ্রথম মৃৎশিল্পের অস্তিত্ব মেলে। প্রাচীন মেসোপটেমিয়ার উত্তর ভূভাগে মাটি খুঁড়ে পত্নতত্ত্ববিদ স্যার লিওনার্দো উলে তিন হাজার বছর আগের তৈরি মৃৎপাত্র উদ্ধার করেন বলে জানা যায়। এছাড়াও মানুষ, গরু, মহিষ, ভেড়া, বানর, শূকর মুরগি, পাখি, মার্বেল, খেলনার পুতুলসহ পোড়ামাটির অসংখ্য প্রতিমা মৃৎশিল্পের নমুনা হিসেবে উদ্ধার করা হয়।”৬৪ দেশের অন্যান্য স্থানের মতো পঞ্চগড় জেলার দারুশিল্প এ অঞ্চলের লোকসংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছে। কাঠের তৈরি আসবাবপত্রে হাতের সুনিপুণ এসব নকশা স্থান পায় কাঠের খড়ম, পিড়াহ্ বা পিড়ি, গাছা, ছাম, গাহীন, ঢেঁকি, পানের বাটা, হুকা, লাঙ্গল, চাকা, অলংকার রাখার বাক্স প্রভৃতি নিত্য ব্যবহার্য সামগ্রিতে। চাহিদার প্রয়োজনে গড়ে উঠেছে পঞ্চগড় জেলার পাট কেন্দ্রিক বিভিন্ন শিল্প। এ জেলার পাট কেন্দ্রিক পণ্য ও জিনিসপত্রের মধ্যে বটিয়া, বটিয়া পাটের আঁশ দিয়ে তৈরি করা হয়।৬৫

পঞ্চগড় জেলার বিভিন্ন গ্রামের মহিলারা অবসর সময়ে সুঁচিশিল্পের বিকাশে গ্রহণী ভূমিকা পালন করেন। “জেলার সূচিশিল্প মধ্যে রয়েছে কাঁথা, কাপড়ের পাখা, পরিধেয় কাপড়, নকশি কাপড়, নকশী কলস,পাথরের থালা বাটি, দস্তরখান, নকশী টেবিলের কাপড়, রুমাল, নকশী জামা, নকশি টুপি, পোড়ামাটির কাজ, কাঠের নকশখচিত আসবাব, বাঁশের চালনি, ধামা, বেঁতের দরজা, শুতিবার ঘরের বাঁশের চেকর, বেড়া, সিলিং, টাটর, ধারা, খাড়া, ঢাকি, কুলা, চালুনি, খাঁচি, বেঁধা, বইজ্ঞা, ভার, পিঁড়ি, চোঙ্গা, চামচ, লাকড়ি, মাচা, ডোলি, ট্যারা, ইত্যাদি তৈরি করা হয়। এছাড়া বাঁশ ও বেতের তৈরি পাখা ব্যবহার রয়েছে।৬৬ লোকশিল্পের অনন্য নিদর্শনও পঞ্চগড় জেলায় লক্ষ্য করা যায়।

ভ. লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার: লোকবিশ্বাসের সাথে লোকসংস্কারের রয়েছে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। পঞ্চগড় জেলার মানুষের মধ্যে লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার পালনের রীতি বেশ পুরোনো। “লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কারের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হলেও লোকসমাজে উভয় বিষয় সমান গুরুত্ব বহন করে।”৬৭ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মতো উত্তরের এ জেলায় লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কারে রয়েছে স্বকীয়তা। দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত এ জেলার কিছু লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

- ঘুমানো অবস্থায় নিজের পরিবারের কারো মৃত্যু দেখলে দূরের কারো বিপদ ঘটে
- ঘুমানো অবস্থায় নিজের পরিবারের কারো বিয়ে দেখলে পরিবারের কেউ বিপদে পড়ে

- মাথার উপর বা বাড়ির আশেপাশে কাক ডাকাডাকি করতে থাকলে বড় কোন আপদের পূর্বাভাস
- বাড়ির আশেপাশে কুকুর কান্না করতে থাকলে বড় কোন আপদের পূর্বাভাস
- মসজিদে আজান শুনে কুকুর কান্না করতে থাকলে প্রতিবেশী কারো মত্যু ঘটে
- দুই শালিক দেখলে মঙ্গল, এক শালিক দেখলে অমঙ্গল হয়
- মাটি শুকনো থাকাকালিন ব্যাঙ ডাকাডাকি করলে বৃষ্টি হয়
- স্বামী, শ্বশুড়-শ্বাশুড়ি ও ভাসুরের নাম ধরে ডাকলে তাদের অকল্যাণ হয়
- ভাঙ্গা আয়নায় মুখ দেখলে কপাল মন্দ হয়
- রাতের বেলা ঘর বা আঙ্গিনা ঝাড়ু দিলে পরিবারের অমঙ্গল
- শনিবার ও মঙ্গলবার ভরদুপুরে একলা কোথাও বের হতে নেই
- মধ্য দুপুরে কোন গাছে উঠলে ভূতে ধাক্কা দেয়
- কোন ফলের গাছে বসে প্রসাব করলে ঐ গাছের ফলন কমে যায়
- সবজ্বি কাটার সময় মায়ের কোথাও কেটে গেলে সন্তানের বিপদের পূর্বাভাস
- পিঠা বানানোর সময় মন্ত্র জানা লোক রান্নাঘরে আসলে পিঠা ফুলে না
- আলাপচারিতার সময় টিকটিকির ডাক সম্মতি হিসেবে ধরা হয়
- কুলায় পা রাখলে বা উপর বসলে তার মামার বুকেব ব্যথা শুরু হয়
- গায়ের খুব পুরাতন ও ছেঁড়া জামা সেলাই করা অমঙ্গলজনক
- বাপের বাড়ি থেকে মেয়েকে ঝাড়ু দিয়ে পাঠালে যশ-বরকত কমে যায়
- পাটখড়ি ভেঙ্গে টুকরো করলে অর্থ ও সম্পদেও অপচয় ঘটে
- বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার পর ঘরের দুয়ারে এঠো পানি ফেললে পরিবারের মৃত ব্যক্তিরা আর আসে না

ম. লোকপ্রযুক্তি: পঞ্চগড় জেলায় লোকপ্রযুক্তির মধ্যে কৃষি ও মাছ ধরার লোক প্রযুক্তিতে বেশ ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। নিত্য ব্যবহার্য লোকপ্রযুক্তির মধ্যে বাঁশের তৈরি মই, জমি কর্ষণের জঙ্গাল বা জোয়াল, ধান শুকানোর কাজে ব্যবহার্য বেঁধা, গরু-মহিষের মুখারি (মুখোশ), খড় শুকানো ও উল্টানোর দারিয়া, ঘাড়ে ধান বহনের বঈঙ্ঘা, মাছ ধরার ডশকা, বিন্না বা কাশবন বা খড়ের চালি, বাঁশের কঞ্চির ছিপ বা বরশি, টুনিজাল, ঠেলা জাল, পানি জাল, কারেন্ট জাল, লাগা জাল, ছিপজাল, ফিকা জাল, টেপাই বা টেমাই, ডশকা, ডিরই, উটকন (পাটের আঁশ দিয়ে রশি তৈরির যন্ত্র) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। “এছাড়াও লোকজন যানবাহন হিসেবে পালকি, ঘোড়ার গাড়ির ডুলি এবং প্রচলিত যানবাহন হিসেবে ভ্যান, সাইকেল, মোটর সাইকেল, টেম্পু, নসিমন, বেবিট্যাক্সি, জমি চাষের পাওয়ার ট্রলার, মহিন্দ্র ট্রলি, পিক-আপ ভ্যান প্রভৃতির বেশ, গরুর গাড়ি, অটো বাইক, মহিশের গাড়ির প্রচলন রয়েছে।”[৬৮]

পঞ্চগড় জেলা নৃতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চল হতে ভিন্ন আবহে ও সমৃদ্ধ ঐতিহ্যে ভাস্বর। বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতির ভাণ্ডারকে পূর্ণতা দানে সর্ব-উত্তরের জেলা পঞ্চগড়ের অবদান খাটো করে দেখার কোন অবকাশ নেই। সবুজ সোনার (চা পাতা) জেলা হিসেবে খ্যাত পঞ্চগড় জেলার রয়েছে সুসমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ইতিহাস ও ঐতিহ্য।

তথ্যনির্দেশ

[১] নাজমুল হক, *উত্তরবঙ্গের লোকসাহিত্যের নৃতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক সমীক্ষা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ২৮

[২] রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস* (১ম খণ্ড, প্রাচীন যুগ), ১৯৭৪, পৃ. ৫-১১

[৩] সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, *বাঙলা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা*, রূপা, কলকাতা, ১৯৯১, পৃ. ২৪-৩৪

[৪] হক, প্রাগুক্ত, পৃ.২৩

[৫] হক, প্রাগুক্ত, পৃ.২৪

[৬] শামসুজ্জামান খান, (সম্পা.), *বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা: পঞ্চগড়*, বাংলা একাডেমি, ২০১৩, পৃ. ২৯

[৭] হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬-৩৮

[৮] হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫-৩৬

[৯] G.A. Grierson, *Linguistic Survey of India*, Vol-111, Part 2, Page. 95

[১০] জীবিতেশ বিশ্বাস, *সহজানন্দে চর্যাপদ*, ইন্তামিন প্রকাশন, ঢাকা, ২০২১, পৃ. ৬৬

[১১] হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩

[১২] হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬

[১৩] হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮-৩৯

[১৪] হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬

[১৫] হক, প্রাগুক্ত, পৃ. (২৫-৪১)

[১৬] খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯

[১৭] মাযহারুল ইসলাম তরু, *চাঁপাইনবাবগঞ্জের লোকসংস্কৃতির পরিচিতি*, বাংলা একাডেমি, ১৯৯৯, পৃ. ১৯

[১৮] হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮-৬০

[১৯] তরু, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫-৩৮

[২০] হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮

[২১] তরু, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২

[২২] খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮

[২৩] খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮-৬০

[২৪] খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২

[২৫] মুহম্মদ আবদুল জলিল, *বাংলাদেশের ফোকলোর চর্চার ইতিবৃত্ত*, অনার্য, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ১১০

[২৬] খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪-৬৭

[২৭] হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৯-১৪০

[২৮] হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৬-১২৯

[২৯] হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩১

[৩০] খান, প্রাগুক্ত, পৃ.৭২-৭৩

[৩১] খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩

[৩২] ছুরতন বানুর নিকট প্রাপ্ত (এপ্রিল, ২০১১), বর্তমান বয়স-৪৭, পেশা- গৃহিণী, বাসস্থান- বোয়ালীমারী,জগদল, পঞ্চগড় সদর, পঞ্চগড়।

[৩৩] খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩

[৩৪] হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭

[৩৫] তরু, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭-১১৮

[৩৬] তরু, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬

[৩৭] তপন বাগচী, *লোকসংস্কৃতির কতিপয় পাঠ*, গতিধারা, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ৪১

[৩৮] হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬

[৩৯] জলিল, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৫

[৪০] খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৮-৩৩৪

[৪১] খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪১-১৪৫

[৪২] খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৬-১৪৮

[৪৩] খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৭

[৪৪] জলিল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১

[৪৫] খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬২-২৭০

[৪৬] জলিল, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪

[৪৭] খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২১-২২৩

[৪৮] তরু, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬১

[৪৯] খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৪-২৩৮

[৫০] খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৯-২৫২

[৫১] খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৩-২৫৭

[৫২] তরু, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০০

[৫৩] খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭২-২৮৭

[৫৪] জলিল, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২

[৫৫] হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৩-১৫৬

[৫৬] খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৮-২৯৬

[৫৭] প্রফেসর মযহারুল ইসলাম (সম্পা.), *ফোকলোর* (চতুর্থ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা), ঢাকা, ২০০১, পৃ. ১০২

[৫৮] হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮-৬৯

[৫৯] খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৭-৩০৫

[৬০] হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৩-১২৪

[৬১] হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৭

৬২. খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮-১৪০

৬৩. খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২-১১৫

৬৪. আবদুল জলিল, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২

৬৫. খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫-১২১

৬৬. খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২-১৩৭

৬৭. হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২

৬৮. খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৯-৩৫০

দ্বিতীয় অধ্যায়

ঐতিহ্যবাহী লোকনাট্যের পরিবেশনা রীতি

২.১ ঐতিহ্যবাহী লোকনাট্য

শিল্প-সংস্কৃতির নানা উপাদানের সাথে মানুষের যোগসূত্র সুপ্রাচীনকালের। আমাদের সুদীর্ঘকালের জীবন ব্যবস্থার শেকড় উদ্ঘাটনে শিল্প-সাহিত্যের ইতিহাস অনুসন্ধান বিরাট ভূমিকা পালন করে। মানুষের বিনোদনের সুপ্রাচীন মাধ্যম সংগীত ও নাটক। গীতিনাট্যপ্রবণ বাংলাদেশের মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক চেতনালব্ধ জ্ঞান, ধর্মীয় সাধনার ফলশ্রুতিতে সৃষ্ট নানাভাবে পরিবেশিত হয়ে আসছে। “প্রাচীন বাংলায় ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারার অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রথম সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় ভরতমুণির নাট্যশাস্ত্রে। এখানে দেশ-কাল-ভাষা অনুসারে চার ধরনের প্রবৃত্তির উল্লেখ রয়েছে।”[১] এছাড়া, বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাপদে বুদ্ধনাটকের উল্লেখ রয়েছে চর্যার ১৭ সংখ্যক পদে। পদকর্তা বীণাপা তাঁর রচিত পদে নৃত্য সম্পর্কে যেভাবে অবতারণা করেছেন তা নিম্নরূপঃ

> “নাচন্তি বাজিল গান্তি দেবী
> বুদ্ধনাটক বিসমা হোই ॥”[২]

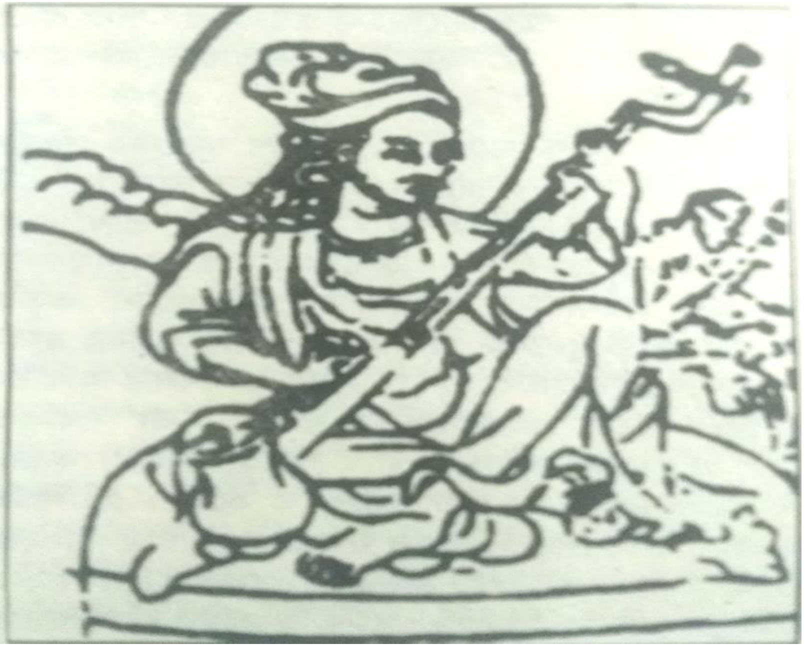

রেখাচিত্র-১ : বাদনরত অবস্থায় বীণাপা

বুদ্ধনাট্য চর্চায় সংগীত, বাদ্য ও নৃত্যের পাশাপাশি অভিনয় কলার উল্লেখ পাওয়া যায় যেখানে ডোম্বীকে কলাবতী রমণী হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। চর্যাপদে বহুবার নৃত্যের বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। নৃত্যক্রিয়ায় পারদর্শী ডোম্বীর চৌষট্টি পাপড়ীর উপর চড়ে নৃত্যের উল্লেখ রয়েছে চর্যার ১০ নং পদে। কৃষ্ণপাদচার্য খুব সুন্দরভাবে তাঁর পদে নৃত্যের বিষয়টি যেভাবে উল্লেখ করেছেন তা নিম্নরূপঃ

“এক সো পদমা চউসট্‌ঠী পাখুড়ি।
তহি চড়ি নাচই ডোম্বি বাপুড়ি ॥”[৩]

তবে, প্রাচীন বাংলার নাটকে নারীর অংশগ্রহনের প্রমাণ মেলে মীনপা- এর নৃত্যরত রেখাচিত্র হতে। নিম্নে নৃত্যরত অবস্থায় মীনপা’র চিত্র উপস্থাপন করা হলোঃ

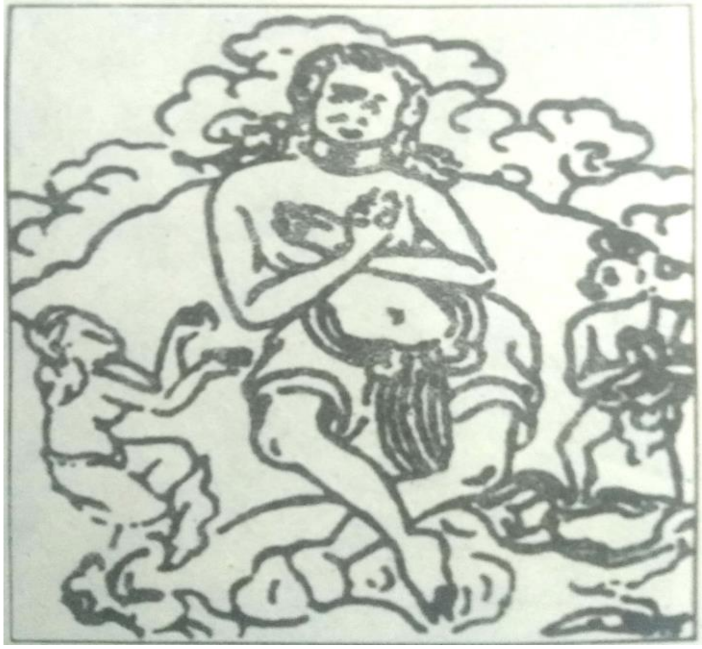

রেখাচিত্র-২ : নৃত্যরত অবস্থায় মীনপা

প্রাচীন বাংলায় প্রচলিত বুদ্ধ নাটকের রূপ মধ্যযুগে এসে কিছুটা পরিবর্তিত হয়। কেননা, সে সময়ে বাংলাদেশে মধ্যপ্রাচ্য হতে মুসলমানদের আগমন ঘটে। ধীরে ধীরে বাংলার বৌদ্ধগণ ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হতে থাকে। নৃত্য-গীত-অভিনয়ে ইসলাম ধর্মে বৈধতা না থাকলেও ধর্মান্তরিত মুসলমানগণ তাদের গ্রাম্যরীতি অত্যন্ত সজীবভাবে লালন করতে থাকে। “এদেশের নাট্যরীতির স্বরূপ হিসেবে কবি জয়দেবের আসরকেন্দ্রিক পরিবেশনা ‘গীতগোবিন্দ’ কাব্যের অবতারণা করা য়ায়। এটি কৃষ্ণ, রাধা এবং সখী তিন চরিত্র বিশিষ্ট নৃত্যসম্বলিত আখ্যানধর্মী পরিবেশনা। এছাড়াও গীতগোবিন্দের যে ৮০টি শ্লোক রয়েছে সেই শ্লোকসমূহ এবং গানগুলি মূল গায়েন ও দোহার কণ্ঠে ধূয়াসহ

পরিবেশিত গীতি-নৃত্য ও বর্ণনার মাধ্যমে পরিবেশিত হতো বলে একে নৃত্য সম্বলিত গীতিনাট্য হিসেবেও অভিহিত করা হয়ে থাকে।"[৪] চৈতন্যের সময়ে অভিনয় কলার সমাদর এবং অভিনয়ের সাথে চৈতন্যের যোগসূত্র ছিল বলে জানা যায়। এ বিষয়ে চৈতন্য-ভাগবতে উল্লেখ রয়েছেঃ

"আজি নৃত্য করিবাঙ অঙ্কের বন্ধনে।"[৫]

প্রাচীনকালে ধর্মীয় বিভিন্ন আচার পালন ও এর কাহিনীনির্ভর নাট্যরীতির একটি নব্য ধারার সৃষ্টি হয়। যেখানে বিভিন্ন ধর্মপূজা আচার ও ক্রিয়াকর্ম বিষয়বস্তু হিসেবে উঠে আসতো। "বাংলায় 'ধর্মপূজা'র প্রচারমূলক গ্রন্থ যা লোকায়ত ধর্মচর্চায় উদ্ভাবিত সেই শূন্যপুরাণ-এ মুসলমানদের চরিত্র ও তাদের আধ্যাত্মিক পরিচয় প্রকাশক অলৌকিক মহিমা ফুটে ওঠেছে।"[৬] এছাড়াও শেখ ফয়জুল্লাহ গোরক্ষবিজয়ে নাটগীত সম্পর্কে যা উল্লেখ করেছেন তা নিম্নরূপঃ

"নাট কর নাটুয়া তাল বাহ ছলে।
তোক্ষার মাদলে কেন গুরু গুরু বোলে।"[৭]

এদেশে পাঁচালি রীতির পরিবেশনা সম্পর্কে নানা মতামত লক্ষ্য করা যায়। "লোকজ ব্যবহারের ভিত্তিতে সুকুমার সেন এদেশের নাটকের ৪টি প্রকরভেদ দেখিয়েছেন। তবে, 'সংগীত-নাটক' থেকে পাঁচালি ও পদাবলী কীর্তনের সৃষ্টি বলে ধারণা করা হয়।"[৮]

ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারায় মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল ও ধর্মমঙ্গল এর কাব্যগুলি পাঁচালী রীতিতে আটদিন এমনকি বারোদিন যাবৎ পরিবেশিত হতো। "পদাবলী শব্দটি পঞ্চালিকা শব্দের রূপান্তর বলে ধারণা।"[৯] এদেশের ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারায় গ্রামীণ লোকায়ত যাপিত জীবনকে উপজীব্য করে উপস্থাপিত প্রণয়মূলক আখ্যানের পরিবেশনা বেশ লক্ষ্যণীয়। পাঁচালী পরিবেশনার সকল উপাদান প্রণয়মূলক পাঁচালির পরিবেশনায় লক্ষ্য করা যায। প্রণয়মূলক পাঁচালির কাহিনী বিন্যাসের সঙ্গে কৃত্যমূলক পাঁচালির বেশ মিল রয়েছে। "নৃত্য, বাদ্য ও নাট্য শিল্পে বাংলাদেশের নাথপন্থায় বিশ্বাসীদের গভীর সম্পর্ক ছিল বলে গুপিচন্দ্রের সন্ন্যাসে এর কাহিনীর অংশ হিসেবে নটী, নৃত্য, বাদ্য ও নাটের উল্লেখ পাওয়া যায়।"[১০] বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী লোকনাট্যে গীত ও নৃত্যের এক অসাধারণ সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়। প্রাচীন বাংলার ঐতিহ্যবাহী নাট্যরীতিতে সংগীত ও নৃত্যের যে মিশ্রিত রূপায়ন ঘটেছে শেখ ফয়জুল্লাহর গোরক্ষবিজয়ে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। অবতারণা নিম্নরূপঃ

"নাচন্তে গোর্খনাথ তালে করি ভয়।
মাটিতে না লাগে পদ আলোগো উপর ॥"[১১]

আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকনাট্যে পুরুষদের নারীর চরিত্রে অভিনয় করার রীতি বেশ প্রচলিত। “নারী চরিত্রে পুরুষদের অন্তর্ভুক্তি গোরক্ষবিজয়েও লক্ষ্যণীয়।”[১২] আমাদের সমাজব্যবস্থার নানা উপাদানকে অবলম্বন করেই লোকনাট্যের উদ্ভব ও বিকাশ বলে ধারণা করা হয়। “লোকনাট্যকলা হচ্ছে এমন এক পরিবেশনশিল্প, নাট্যকার, নির্দেশক ও অভিনয় শিল্পীদের প্রায় সকলেই গ্রামীণ জনজীবনের সাথে সম্পৃক্ত।”[১৩]

হাজার বছর ধরে প্রচলিত এদেশের- নাট্যধারা যে বেশ সমৃদ্ধ তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। এদেশে বহু জাতি ও ধর্মের শাসন ও শোষণে আপামর জনতার জীবনাচারে যেমন বৈচিত্র্য এসেছে, তেমনি মানুষের ধর্ম, বিশ্বাস, দর্শন, শিল্পকর্ম, সাহিত্য এবং সংস্কৃতির মাঝেও একই বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। “বিশিষ্ট ফোকলোরবিদ ও নাট্য গবেষক সায়মন জাকারিয়ার মতে, প্রচলিত নাট্যরীতিতে দুই ধরণের বৈচিত্র্য রয়েছে। এর একটি বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য এবং অপরটি আঙ্গিক বা পরিবেশনারীতির বৈচিত্র্য।”[১৪]

বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যে এদেশের ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারায় বিভিন্ন আখ্যানধর্মী পরিবেশনার মধ্যে বাংলায় কারবালা যুদ্ধ ও তার বেদনা প্রকাশক হিসেবে উপস্থাপিত জনপ্রিয় ও হৃদয়গ্রাহী ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারা ইমামযাত্রা ও জারিগান অনেক জনপ্রিয় পরিবেশনা। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে জারিগান ও ইমাম যাত্রার বেশ কিছু পরিবেশনার প্রচলন রয়েছে। এছাড়াও মহররম উপলক্ষে জারি পালার আয়োজন আজো চিত্ত আন্দোলিত করতে সক্ষম।

“এদেশে মধ্যযুগে বিভিন্ন পীরের উপাসনামূলক পরিবেশনার প্রচলন শুরু হয়। এই পীরদের মধ্যে অনেকের অস্তিত্ব থাকলেও বেশিরভাগই সাধারণ মানুষের সৃষ্টি। “জনপ্রিয় পীরদের মধ্যে সত্যপীর, গাজী পীর, মানিক পীর, বড় পীর, খোয়াজ খিজীর পীর, মাদার পীর প্রমুখ উল্লেখযোগ্য ছিলেন এরূপ ধারণা করা হয়।”[১৫]

এদেশে লোকায়ত পীর-পীরানি ও তাদের কাল্পনিক জীবনী ভিত্তিক মাহাত্ম প্রকাশক আখ্যান বেশ সমাদৃত। এদেশে মুসলমান ধর্মের পাশাপাশি অন্য ধর্মমতে বিশ্বাসী মানুষদের মাঝেও পীরবাদে বিশ্বাস ও তাদের সংস্কৃতি পালন করতে দেখা যায়। লৌকিক পীর ও তাদের কাহিনী নিয়ে নানা আখ্যান এদেশে পরিবেশিত হয়। এদেশে স্থানীয় ঘটনা বা ইতিহাস আশ্রিত প্রেম মাহাত্ম প্রকাশধর্মী আখ্যান হিসেবে সমধিক পরিচিত ও জনপ্রিয় লোকনাট্য পরিবেশিত হতে দেখা যায়। বাংলাদেশের সামাজিক ও পারিবারিক নানা চিত্র ফুটে ওঠে গ্রামীণ মানুষের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনকাহিনী নির্ভর নানা আখ্যানধর্মী পরিবেশনায়। যেমন- আলকাপ গান (চাপাইনবাবগঞ্জ), গম্ভীরা গান, টাঙ্গাইলের সঙযাত্রা বা সঙখেলা হলো জনপ্রিয় নাট্য আঙ্গিক। এছাড়া, বিচার গান ও কবিগান তত্ত্ব ও তথ্যমূলক পরিবেশনা হিসেবে জনপ্রিয়তা লাভ করে।

সাধারণত কবিগানের বিষয়বস্তু বাংলার সাংস্কৃতিক, সাহিত্যিক, ধর্মীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অভিজ্ঞতাকে আশ্রয় করে নির্বাচন করা হলেও সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে কবিগানের আসরে নতুন নতুন ভাবনার বহিঃপ্রকাশ ঘটছে। "এদেশের ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারায় পৌরাণিক ও ইতিহাস নির্ভর এবং পেশাভিত্তিক পরিবেশনা আজো সমাদর লাভ করে।"[১৬]

২.২. ঐতিহ্যবাহী লোকনাট্যের আঙ্গিক পরিচয়

বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারায় বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যের পাশাপাশি আঙ্গিক বৈচিত্র্যও পরিবেশনারীতির মাধ্যমে স্বতন্ত্র মহিমায় উদ্ভাসিত। "অঞ্চলভেদে একই বিষয়বস্তুর পরিবেশনারীতি এদেশে যেমন ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে তেমনি একই অঞ্চলে একই বিষয়বস্তুর নানা ধরণের পরিবেশনারীতির প্রচলন রয়েছে। যেমন- সর্পদেবী মনসার বিচিত্র পরিবেশনারীতির মধ্যে সর্বাধিক উচ্চারিত নাম 'পদ্মাপুরাণ গান'। তবে, নাম একই হলেও পরিবেশনারীতি বা উপস্থাপনায় ভিন্ন আঙ্গিক পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী লোকনাট্যেও ধারায় বিষয়বস্তু একই হলেও আঙ্গিক বৈচিত্র্য রয়েছে। এদেশের পাঁচালী রীতির পরিবেশনার মধ্যে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মনসামঙ্গলই সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় বলে ধারণা করা হয়ে থাকে। তাই তা জনপ্রিয়তার পাশাপাশি এদেশের জনমনে আবেদন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়।"[১৭]

এদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সর্পদেবী মনসা বা পদ্মাদেবীর আখ্যান পরিবেশনা ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিবেশন করতে দেখা যায়। "একই আখ্যান কোথাও 'মনসামঙ্গল', কোথাও আবার 'পদ্মার নাচন', 'ভাসান যাত্রা', কিংবা 'পদ্মাপুরাণ গান', 'বিষহরির গান', 'কান্দনী বিষহরির গান' 'মা মনসা', 'বেহুলা সখীর গান', 'বেহুলার নাচাড়ি', 'রয়ানী' ইত্যাদি পরিবেশনার অবতারণা করতে পারি।"[১৮]

বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী লোকনাট্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি পরিবেশনা সম্পর্কে নিম্নে আলোকপাত করা হলোঃ

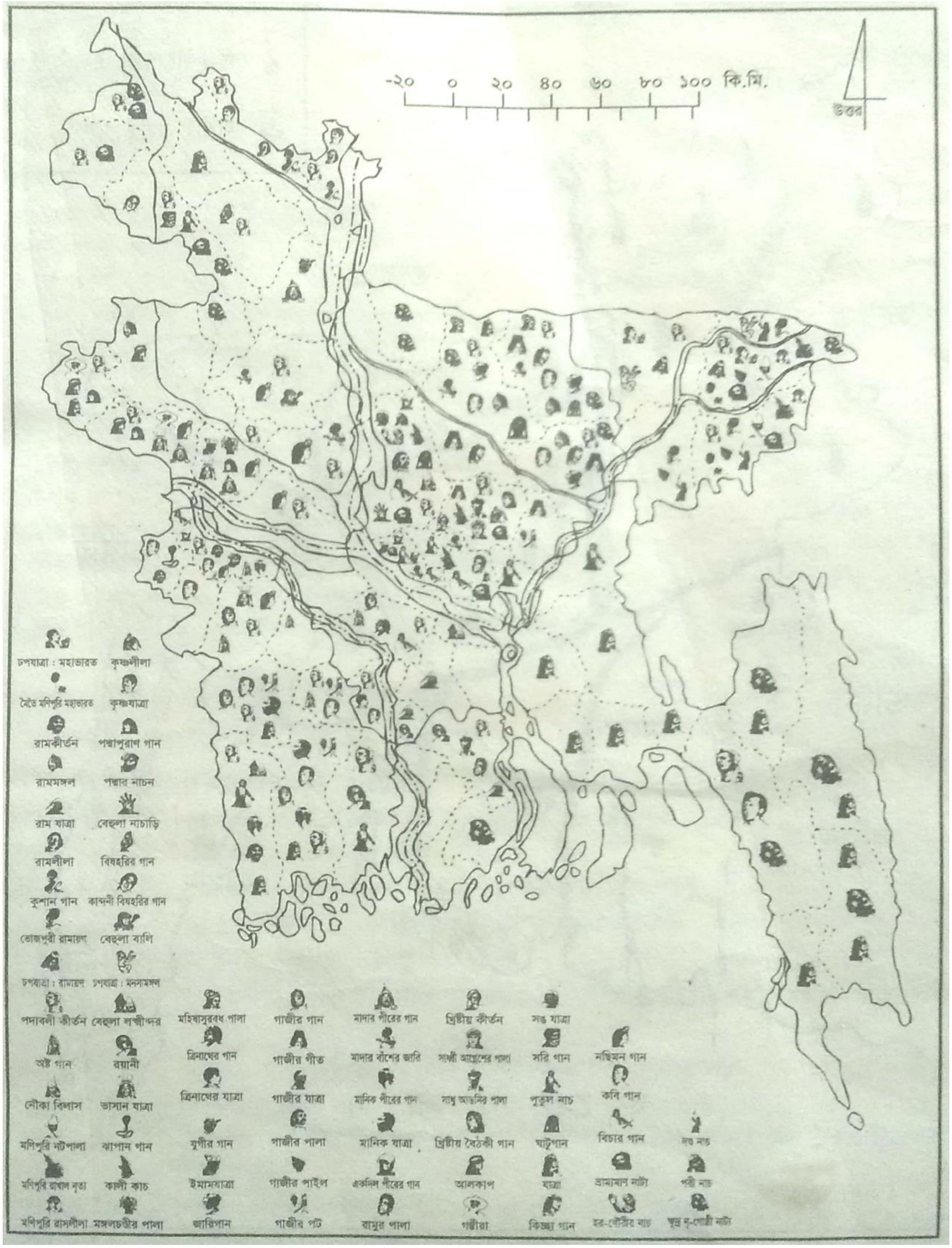
-২০ ০ ২০ ৪০ ৬০ ৮০ ১০০ কি.মি.
উত্তর
চপযাত্রা : মহাভারত
কৃষ্ণলীলা
মৈতৈ মণিপুরি মহাভারত
কৃষ্ণযাত্রা
রামকীর্তন
পদ্মাপুরাণ গান
রামমঙ্গল
পদ্মার নাচন
রাম যাত্রা
বেহুলা নাচাড়ি
রামলীলা
বিষহরির গান
কুশান গান
কান্দনী বিষহরির গান
ভোজপুরী রামায়ণ
বেহুলা বালি
চপযাত্রা : রামায়ণ
চপযাত্রা : মনসামঙ্গল
পদাবলী কীর্তন
বেহুলা লখীন্দর
অষ্ট গান
রয়ানী
নৌকা বিলাস
ভাসান যাত্রা
মণিপুরি নটপালা
ঝাপান গান
মণিপুরি রাখাল নৃত্য
কালী কাচ
মণিপুরি রাসলীলা
মঙ্গলচণ্ডীর পালা
মহিষাসুরবধ পালা
গাজীর গান
মাদার পীরের গান
খ্রিষ্টীয় কীর্তন
সঙ যাত্রা
ত্রিনাথের গান
গাজীর গীত
মাদার বাঁশের জারি
সাঞ্জী আয়েশের পালা
সরি গান
নছিমন গান
ত্রিনাথের যাত্রা
গাজীর যাত্রা
মানিক পীরের গান
সাধু আত্তনির পালা
পুতুল নাচ
কবি গান
যুগীর গান
গাজীর পালা
মানিক যাত্রা
খ্রিষ্টীয় বৈঠকী গান
ঘাটুগান
বিচার গান
লড় নাচ
ইমামযাত্রা
গাজীর পাইল
একদিল পীরের গান
আলকাপ
যাত্রা
ভ্রাম্যমাণ নাট্য
পরী নাচ
জারিগান
গাজীর পট
বামুর পালা
গম্ভীরা
কিচ্ছা গান
হর-গৌরীর নাচ
ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী নাট্য

মানচিত্র- ৩ : বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারা

২.২.১. কুশান গান

বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারায় কুশান গানের পরিবেশনা কুড়িগ্রাম ও লালমনিরহাট বিশেষ করে রাজবংশীদের মাঝে লক্ষ্য করা যায়।লোকনাট্য হিসেবে এদেশে কুশান গানের বেশ জনপ্রিয়তা রয়েছে। “মূলত কুশান গান হলো ধ্রুপদী মহাকাব্য রামায়ণ ও তার বিভিন্ন চরিত্রের মাহাত্ম প্রকাশক আখ্যান। কারো কারো মতে, ‘কুশীলব’ শব্দ থেকে কুশান শব্দটি উৎপন্ন। কুশিলব শব্দটি সংস্কৃতজাত যার অর্থ অভিনয়ের পাত্র-পাত্রী।”[১৯]

পরিবেশনার সময়

বর্তমানে খুব একটা প্রচলন না থাকলেও কুশান গান মূলত আয়োজন করা হতো গ্রাম-বাংলার বিভিন্ন উৎসব, হিন্দুদের বিভিন্ন পূজার অনুষ্ঠান উপলক্ষে। কুশান গানের পরিবেশনা রাতে শুরু হয়ে ভোর রাত কখনো কখনো সকাল পর্যন্ত পরিবেশিত হতো।

কুশান গানের দল ও বায়না

কুশান গানের পৃষ্ঠপোষক গ্রামের সাধারণ লোকজন। সাধারণত কুশান গানের দল ১৫ থেকে ২০ জন কিংবা কোনক্ষেত্রে এর বেশিও সদস্য নিয়ে গঠিত হয়ে থাকে। গানের দলের ম্যানেজার পরিবেশনার পূর্বে সম্মান হিসেবে ১০ থেকে ১৫ হাজার টাকা ধার্য করেন। কোন কোন ক্ষেত্রে টাকার অংকটা একটু বেশি হয়ে থাকে। যেহেতু গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারা সেহেতু আয়োজনের টাকা সম্মিলিতভাবে এলাকার লোকজন আয়োজক কমিটির মাধ্যমে সংগ্রহ করে থাকে। গ্রামের সাধারণ জনগোষ্টীর সম্মিলিত প্রয়াসে এর আয়োজন এক ভিন্নতর পরিবেশনারীতিতে পরিণত হয়।

পরিবেশনার স্থান

কুশান গানের পরিবেশনা মূলত মন্দির প্রাঙ্গণ, বৃহৎ কোন বটবৃক্ষতলা, এমনকি বাড়ির উঠানেও হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে শিল্পীদের জন্য ১৮ থেকে ২০ ফুট বর্গাকার স্থানের চারদিকে ৪টি খুঁটি পুঁতে পরিবেশনার আসর তৈরি করা হয়। পূর্বে কলা গাছ খুঁটি হিসেবে ব্যবহার করা হলেও বর্তমানে বাঁশ ব্যবহার করা হয়। উপরে ছাউনি হিসেবে পূর্বে পুরাতন শাড়ির ব্যবহার ছিল তবে টিনের ছাউনিও দেওয়া হয়, বর্তমানে ছামিয়ানার ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

দর্শকগণ মূল মঞ্চের চারদিকে খড় পেতে বা চটের পাটিতে অবস্থান গ্রহণ করেন। মূল গায়েন, দোহার, বাদক, গীহাল ছোকরা মূল মঞ্চের মাঝেই অবস্থান করে তাদের পরিবেশনা করে থাকেন।

আলোকসজ্জা

পরিবেশনার স্থানে আলো হিসেবে পূর্বে হ্যারিকেন, হ্যাজাক বাতি ব্যবহার হলেও বর্তমানে বৈদ্যুতিক ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

সাজসজ্জার ঘর

কুশান গানের অভিনেতাগণ সাধারণত কম দামের হালকা প্রসাধনী ব্যবহার করে থাকেন। দেখতে উজ্জ্বল দেখায় মুখে তেমন কিছু ব্যবহার করেন। অপরদিকে মূল গায়েন ভাল মানের প্রসাধনী ব্যবহার করেন। তবে প্রায় প্রত্যেকেই সাজসজ্জার পর মুখে ও গলায় জরির টুকরা ছিটিয়ে থাকেন। পরিবেশনা যদি কোন বাড়ির আঙ্গিনায় হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে বাড়ির কোন একটি ঘর সাজঘর হিসেবে ব্যবহার করা হয়। অন্যথায় খোলা মাঠে বা মন্দির প্রাঙ্গনে কুশান গান পরিবেশিত হলে কুশিলবরা (অভিনয়ের পাত্র-পাত্রীগণ) একবারেই সাজসজ্জা নিয়ে মঞ্চে বসে পড়েন।

কুশান গানের শিল্পীদের পরিচয়

কুশান গানে মূল গায়েনকে বলা হয় গিদাল। এছাড়া ছোকরা চরিত্র ফুটিয়ে তুলতে ছেলেরা মেয়েদের পোশাক পড়ে থাকেন। আর মঞ্চে আনন্দমুখর ভাব ফুটিয়ে তোলেন ‘ভাড়’ চরিত্র।

ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্র

কুশান গানে বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে হারমোনিয়াম, খোল, করতাল বা জুড়ি, বেহালা, দোতারা ব্যবহার করা হয়। তবে বেণা নামে একটি তারযন্ত্র কুশান গানের মূল বাদ্যযন্ত্র হিসেবে এর ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

পোশাকের ব্যবহার

রামায়ণের কাহিনী অবলম্বন করে কুশান গানের পরিবেশনায় গিদাল সাদা ধুতি ও পাঞ্জাবি পরিধান করে একটা উত্তরীয় কাঁধে ঝুলিয়ে অভিনয় করেন। সীতা চরিত্রে রূপদানকারী অভিনেত্রী ও ছোকরাগণ উজ্জ্বল রঙের শাড়ি, ব্লাউজ পরে অভিনয় করেন। সাদা ধুতি ও হাফ হাতা গেঞ্জি পরে লব ও কুশ চরিত্রে অভিনয় করতে দেখা যায়।

পরিবেশনারীতি

কুশান গানে সংলাপ, অভিনয় ও নৃত্য-গীতের মিশ্রণ থাকলেও মূলত তা বর্ণনাত্মক রীতির ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারা বলে বিবেচিত। গিদাল আসর বন্দনা দিয়ে শুরু করে রাম বন্দনা, দেব-দেবী বন্দনা, আসর ও দর্শক ভক্ত, ইত্যাদির বন্দনা শেষ করে পালার নাম প্রকাশ করে থাকেন।

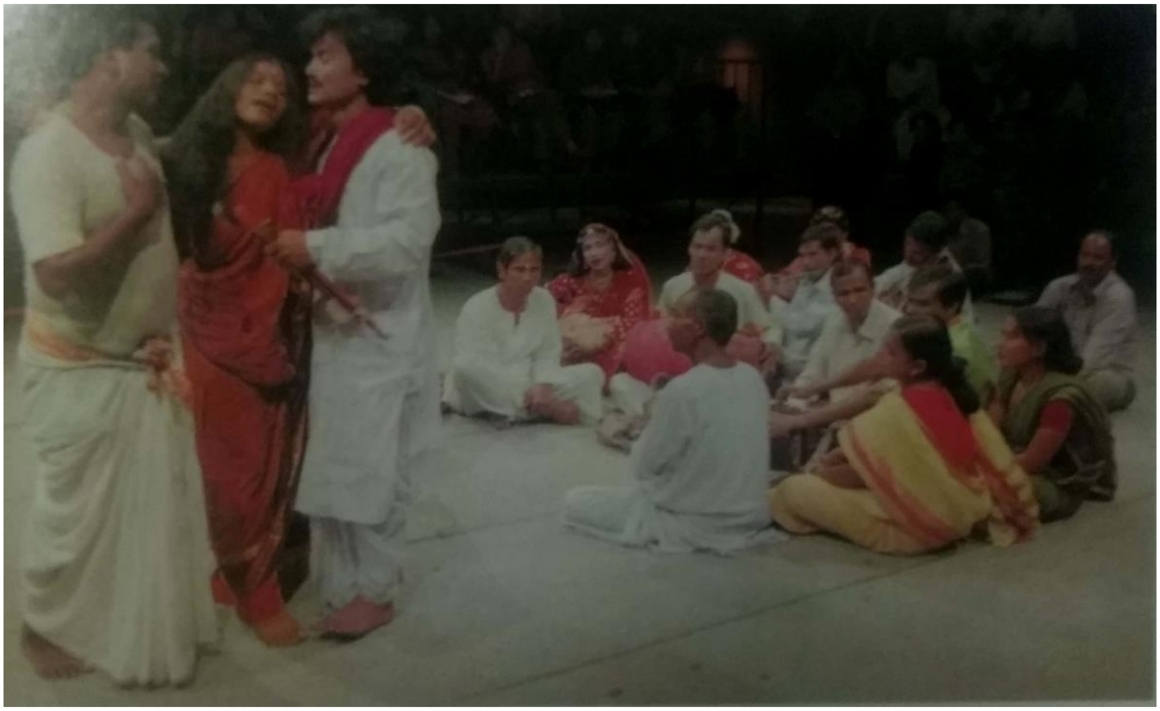

,

আলোকচিত্র-৫: কুশান গান

কুশান শিল্পীদের বর্তমান অবস্থা

এদেশের কুড়িগ্রাম অঞ্চলে কুশান গানের শিল্পীদের খুব জনপ্রিয়তা ছিলো। সারাদেশে তাদেরকে কুশান শিল্পী হিসেবে একনামেই চিনতো। "বর্তমানে কুড়িগ্রাম লালমনিরহাট জেলায় কয়েকজন জনপ্রিয় কুশানশিল্পী ঐতিহ্যবাহী এই ধারাকে আজো ধরে রেখেছেন।"[২১]

২.২.২. কান্দনী বিষহরির গান

বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী লোকনাট্য হিসেবে বৃহত্তর দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন গ্রামে সর্পদেবী বা মনসা ও তার আখ্যান হিসেবে কান্দনী বিষহরির গান পরিবেশিত হয়ে থাকে। বিষহরির কান্নাকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদানের পাশপাশি বেহুলা চরিত্র এ ধারার পরিবেশনায় প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয়ে ওঠে। অতিসংক্ষেপে বেহুলার জন্ম এবং পূজা লাভের প্রত্যাশার মাধ্যমে কয়েকটি পর্বে পরিবেশনা হয়ে থাকে।

কান্দনী বিষহরি গানের প্রচলন

ঐতিহ্যবাহী কান্দনী বিষহরির গান বা কানী বিষহরা গান পঞ্চগড়, ঠাঁকুরগাও, দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে আজো বেশ জনপ্রিয়। “কান্দনী বা কানী বিষহরী রাজবংশী হিন্দুদের প্রাত্যহিক পারিবারিক পূজার অন্যতম প্রধান দেবী হিসেবে বিবেচ্য। সাধারণত শ্রাবণের শেষ ও ভাদ্র মাসের প্রথম দিনে কলা গাছের তৈরি ভুরা ভাসিয়ে দেয়ার মধ্যদিয়ে বিষহরা দেবীকে বিদায় জানানোর রীতি প্রচলিত।”[২০]

বিষহরির দলের বায়না

বিষহরির পালাকার সামান্য সম্মানী পেয়ে থাকে। এর আয়োজন ও পৃষ্ঠপোষকতা গ্রামের সাধারণ মানুষদের মধ্যে নিহিত থাকায় দল প্রতি ১০ হাজার থেকে সর্বোচ্চ ১৫ হাজার টাকার বায়না করা হয়ে থাকে।

পরিবেশনার সময়

হিন্দুদের বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান উপলক্ষে বিষহরির পালা পরিবেশিত হলেও মূলত মনসার পূজাকে উপলক্ষ্য করে বর্ষাকালে অর্থাৎ আষাঢ়-শ্রাবণ মাসের পরিবেশনা বেশি লক্ষ্য করা যায়। এছাড়া গ্রামের মানুষ বিভিন্ন মানত উপলক্ষে কান্দনী বিষহরির পালা আয়োজন করে থাকে। রাত ৯টা কিংবা ১০টায় এ পালা শুরু হয়ে ঠিক পরের দিন প্রায় সকাল ১০টা পর্যন্ত পরিবেশিত হয়ে থাকে। তবে, শেষ রাত্রে ২ঘন্টা বিশ্রামের জন্য

মঞ্চ বা আসর

কান্দনী বিষহরির গান পরিবেশনের জন্য দেড় থেকে দুই ফুট উঁচু অস্থায়ী মঞ্চ তৈরি করা হয় যার চাঁর কোণে ৪টি কলা গাছ বাঁশ বা কাঠের খুঁটি পুঁতে উপরে কাপড়, টিন বা কাপড়ের ছাউনি দেওয়া থাকে। তবে মঞ্চের একদিকের সীমান্ত রেখার মাঝামাঝি অবস্থান সেট হিসেবে দুটি চেয়ার স্থাপন করা হয়। চেয়ার দুটির ঠিক বিপরীত দিকে মঞ্চে

উঠার জন্য মাটি বা ইটের দুই থেকে তিনটি সিঁড়ির ধাপ নির্মিত হয়। মঞ্চের উত্তর বা দক্ষিণ দিকে পরিবেশনার মঙ্গল কামনার্থে একটি চামর ঝুলিয়ে রাখা হয়। চামরের ঠিক বিপরীত দিকে মঞ্চের নিচে সারিবদ্ধভাবে বাদ্যযন্ত্র ও দোহারদের অবস্থান ঠিক করা হয়। বিষহরা গানের পরিবেশনা বাড়ির আঙিনায় হয়ে থাকলে বাদকদল মাঝখানে অবস্থান করেন এবং তাদেও চারপাশে ঘুরে ঘুরে চরিত্র অনুযায়ী শিল্পীগণ নৃত্য সহযোগে অভিনয় করেন।

আলোকসজ্জা

কান্দনী বিষহরির গান পরিবেশনে আলোকসজ্জা হিসেবে পূর্বে হ্যাজাক বাতির ব্যবহার হলেও বর্তমানে বৈদ্যুতিক উন্নয়নের ফলে বিদ্যুতের ব্যবহার ব্যাপকভাবে লক্ষ্য করা যায়।

সাজগৃহ

সাজসজ্জার জন্য মঞ্চের খানিকটা দূরে কাপড় ঘেরা অস্থায়ী ব্যবস্থা থাকে। অনেক সময় সাজসজ্জার জন্য একজন দায়িত্বে থাকেন। তবে, বেশিরভাগ সময়ে কুশিলবগণ চরিত্র অনুযায়ী নিজেরাই তৈরি হন।

পোশাকের ও অলংকারের ব্যবহার

কান্দনী বিষহরির গানে প্রধান চরিত্রসমূহের জন্য বিশেষ পোশাক থাকলেও অন্যান্য কিছু মূখ্য চরিত্রের পোশাক সাধারণ পোশাকের আদলেই। কান্দনী বিষহরির গানের ক্ষেত্রে প্রায় সকে একাধিক চরিত্রে অভিনয় করতে দেখা যায়। যদিও প্রতিটি দলে ২০ থেকে ৩০ জনের সদস্য থাকে। এক্ষেত্রে পোশাক পরিবর্তনে কিছুটা ব্যত্যয় ঘটে।

অভিনয় উপকরণ

কান্দনী বিষহরির গানে বেশ কিছু সংখ্যক অভিনয় উপকরণ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। যেমন- চামর, তীর-ধনুক, তরবারি, লাঠি, বড়শি, গামছা, রুমাল, সাপের প্রতীক, শাড়ি, প্রদীপ ডালা, ত্রিশূল, ধূপদানি, শাখা-সিঁদুর, মালা প্রভৃতি সামগ্রী ব্যবহৃত হয়।

বাদ্যযন্ত্র

কান্দনী-বিষহরির গানে হারমোনিয়াম, কোন কোন ক্ষেত্রে ক্যাসিও, খোল, করতাল, জিপসী ব্যবহার বেশ লক্ষ্যণীয়।

আসর পরিচালনা

কান্দনী বিষহরির গানে পরিচালনার দায়িত্বে ম্যানেজার নিযুক্ত থাকেন। সাধারণত গিদাল ও সহগিদালগণ এ দায়িত্ব পালন করলেও কখনো কখনো অন্যান্য মূখ্য চরিত্রে অভিনয় করা অভিনেতা আসর পরিচালনা করে থাকেন।

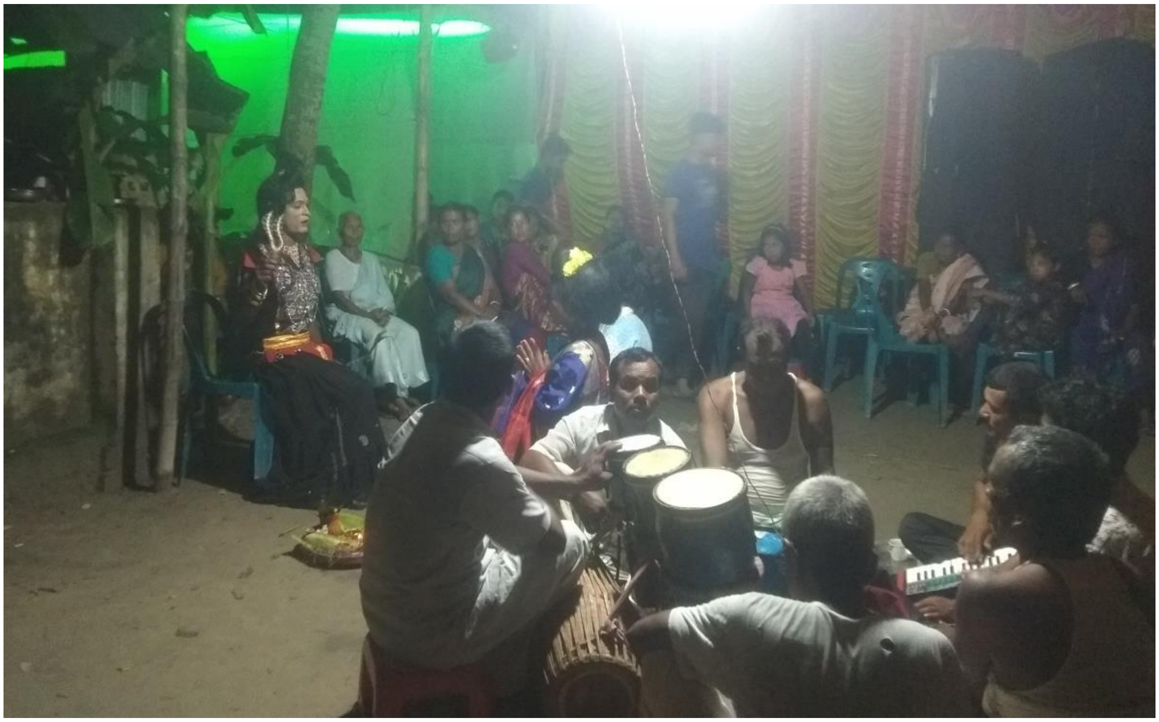

আলোকচিত্র- ৬ : কান্দনী বিষহরির গান, লক্ষ্মীর হাট, দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড়

পরিবেশনারীতি

কান্দনী বিষহরির গানে মূল পরিবেশনা শুরুর আগে কুশিলবগণ মন্দিরে মনসা দেবীকে ভক্তি জানিয়ে এসে একে একে চাঁদ সওদাগর, লক্ষীন্দর, বেহুলা মঞ্চে বন্দনা করেন। এ ধরণের পরিবেশনায় বিভিন্ন চরিত্রে সংলাপাত্মক অভিনয়ের পাশাপাশি বর্ণনাত্মক অভিনয়ের রীতি প্রচলিত। যদিও বর্ণনাত্মক অভিনয়ে মূল গায়েন বা গিদালের একটি বিশেষ ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়।

শিল্পীদের বর্তমান অবস্থা

কান্দনী বিষহরির গান বৃহত্তর দিনাজপুর জেলা ছাড়াও পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও জেলার বিভিন্ন গ্রামে পরিবেশিত হয়ে থাকে। কান্দনী বিষহরির গান পরিবেশনে এখন যেন অনেকটা ভাটা পড়েছে। পঞ্চগড় জেলার দেবীগঞ্জ উপজেলার শান্তির হাট নামক স্থানে একটি প্রসিদ্ধ কান্দনী বিষহরির গানের দলের সন্ধান পাওয়া যায়।

আলোকচিত্র- ৭ : 'মা মনসা' নামে পরিবেশনা (মালী পাড়া, ধাক্কামারা, পঞ্চগড়)

২.২.৩. জারিগান

বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী লোকনাট্য হিসেবে ইসলামের ইতিহাসের মর্মান্তিক কারবালাযুদ্ধ ও ইমাম হাসান-হোসেনের বেদনাদায়ক কাহিনী অবলম্বনে বাংলাদেশের প্রায় সব অঞ্চলেই জারি গানের পরিবেশনা লক্ষ্য করা যায়। বিলাপের সুরে নৃত্যসহযোগে জারিগানের পরিবেশনা এখনো স্বকীয় আবেদন ধরে রেখেছে। যদিও কারবালার মর্মান্তিক ঘটনা জারি গানের মূল উপজীব্য বিষয়, তথাপি জারি গানের বিষয়বস্তু হিসেবে বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

জারিগানের উৎপত্তি ও বিকাশ

জারি গানের উৎপত্তি হিসেবে পঞ্চদশ শতকের বৈঠকী ধারার ‘জঙ্গনামা’ পরিবেশনাকে ধরা হয়ে থাকে। তবে গবেষকদের ধারণা ‘জঙ্গনামা’ বৈঠকীরীতির পরিবেশনার মাধ্যমে বিবর্তনের ধারায় বাংলাদেশের স্থানীয় সমাজে শোকগীতি হিসেবে জারিগান অনেক বেশি জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

জারিগান পরিবেশনের সময়

বাংলাদেশে বর্তমানে সারাবছর জারি গানের আসর হয়ে থাকে। যদিও মহররম মাসে জারিগানের মূল আয়োজন লক্ষ্য করা যায়। ১০ই মহররমকে কেন্দ্র করে কয়েকদিন যাবৎ দিবা-রাত্রি এ গানের পরিবেশনা হয়ে থাকে। বর্তমানে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও উৎসবাদিতে জারি গানের পরিবেশনা জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

সম্মানি ও পৃষ্ঠপোষকতা

ইসলামের ইতিহাসে ঘটে যাওয়া কারবালার শোক পালনের উদ্দেশ্যে মুসলমানগণ মহররম মাসে জারি গানের আয়োজন করে থাকেন। জারি গাানের দলকে ৫ থেকে ১০ হাজার টাকা সম্মানি প্রদান করা হয়ে থাকে।

জারিগানের মঞ্চ

জারিগানের পরিবেশনা গ্রামের পাশাপাশি শহরেও আজকাল আয়োজন করা হয়ে থাকে। গ্রামের খোলা মাঠ, বাড়ির আঙ্গিনা জারির মঞ্চ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। দর্শকের অবস্থান চতুর্দিকে হয়ে থাকে এবং মাঝখানে দাঁড়িয়ে বা বসে শিল্পীগণ জারিগান পরিবেশন করে থাকেন।

জারিগানের শিল্পী

জারিগানের দল কখনো ১০ থেকে ১৫ জনের আবার কখনো বা এর বেশিও হয়ে থাকে। তাদের নিজস্ব কিছু নামকরণ ও করা হয়ে থাকে। যেমন- প্রধান গায়ককে সাধারণত ‘বয়াতি’ হিসেবেই সম্বোধন করা হলেও জারিগানের নৃত্য পরিবেশনায় যিনি থাকেন তাকে জারিয়াল আবার কখনো খেলোয়াড় নামে ডাকা হয়। নৃত্য পরিচালনার জন্য যিনি ভূমিকা পালন করেন তাকে রেফারি বলে। রেফারির বাঁশিতে ফু-দেয়ার উপর নৃত্যের গতি পরিবর্তিত হয়ে থাকে।

আলোকসজ্জা

জারিগানের আলোকসজ্জা হিসেবে বর্তমানে বিদ্যুতের ব্যবহার বেশ লক্ষণীয়। তবে এ গানের আয়োজন গ্রামের এলাকায় দিনের বেলায় হয়ে থাকে বলে আলোর ব্যবস্থার দরকার হয় না। "পূর্বে জারিগানের আয়োজন রাতের বেলায় বেশি হতো বলে বিদ্যুতের বিকল্প হিসেবে হ্যারিকেন বা হ্যাজাক বাতির ব্যবহার করা হতো।"[২২]

সাজসজ্জার ঘর

জারিগানের শিল্পীদের অন্যান্য পরিবেশনার শিল্পীদের মতো সাজঘর হিসেবে আলাদা ব্যবস্থা না থাকলেও চলে। এ গানের শিল্পীরা যে কোন স্থানে তাদের সাজের ক্রিয়া সম্পন্ন করতে সক্ষম।

পোশাকের ব্যবহার

জারিগান পরিবেশনের জন্য শিল্পীগণ সাধারণত লাল-সবুজের কাপড় ব্যবহার করে থাকেন। তবে সাদা গেঞ্জি (স্যান্ডো), সাদা লুঙ্গি বা ধূতি, গলায় রুমাল, কোমরে লাল বন্ধনীর ব্যবহার বেশ লক্ষণীয়।

বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার

জারিগানে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার না হলেও উত্তরবঙ্গের বেশ কিছু অঞ্চলে বেহালা, দোতারা ও বাংলা ঢোলের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এছাড়াও মূল গায়েন বা বয়াতি পায়ে ঘুঙ্গুর পরিধান করে থাকেন।

বিষয়বৈচিত্র্য

জারিগানের আঙ্গিক ও বিষয়গত বৈচিত্র্যের কারণে ভিন্নতা লক্ষ্যণীয়। "জারির বিষয়ের স্বাতন্ত্র্য বিচারে কয়েকটি শ্রেণীকরণ করা হয়েছে তা নিম্নরূপ ঃ

১. ধর্মীয় ইতিহাস ভিত্তিক জারি, ২. কারবালার মর্সীয়া নিয়ে বিভিন্ন ঘটনাকেন্দ্রিক, ৩. সামাজিক সংস্কার বিষয়ক, ৪. গণচেতনা ও রাজনৈতিক আন্দোলন ভিত্তিক, ৫. শাস্ত্র ও মতবাদ ভিত্তিক বিতর্কমূলক, ৬. মনীষীদের জীবনী ভিত্তিক, ৭. প্রেম, উপাখ্যান ও পৌরাণিক চরিত্র ভিত্তিক জারি ইত্যাদি।"[২৩]

সুরবৈচিত্র্য

জারিগানের সুরে বিভিন্ন অঞ্চলের আঞ্চলিক সুরের বা লোকসুরের প্রভাব রয়েছে। "জারিগানে প্রধানত পুঁথি পড়ার সুর, রাখালি, রামায়ণ গানের সুরের মিশ্রণ রয়েছে। অধিকাংশ জারিগান পয়ার ছন্দে বিলম্বিত, মধ্য ও দ্রুত লয়ে গ্রাম্যশিল্পীদের মাধ্যমে এক ভিন্ন আবহ তৈরি করে।"[২৪]

জারিগানের পরিবেশনারীতি

বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী লোকনাট্যের ধারায় এদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে জারিগানের বহু ধরণের পরিবেশনারীতি প্রত্যক্ষ করা যায়। তবে কারবালার মর্মান্তিক কাহিনী অবলম্বন করে জারিগান পরিবেশিত হয়ে থাকলেও ইমাম হাসান-হোসেন, মুয়াবিয়া এজিদ প্রভৃতি চরিত্রের পারিবারিক ও সাংসারিক জীবন নির্ভর পরিবেশনারীতি বেশ গুরুত্ব পেয়ে থাকে। স্থানীয় বয়াতি-জারিয়াল-খেলোয়াড়গণ মীর মশাররফ হোসেন রচিত আখ্যানধর্মী অমরকাব্য বিষাদসিন্ধু অবলম্বনে বেশ কয়েকটি রোক ছন্দে জারিগান পরিবেশন করে থাকেন। এছাড়া, "নূপুর পরিধান করে জারিগানে নৃত্য পরিবেশনের প্রচলন রয়েছে। জারিগানে ব্যবহৃত নৃত্যকে মণিপুরি বা চৈনিক নৃত্যের সাথে তুলনা করা হয়েছে।"[২৫] কারবালার এরূপ অনেক ঘটনাকে কেন্দ্র করে ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারায় এদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে জারিগান পরিবেশনের পাশাপাশি জারি নাচ ও শোভযাত্রামূলক জারি পরিবেশন করতে দেখা যায়।

জারিগানের কুশিলবদের বর্তমান অবস্থা

জারি গানের বর্তমান অবস্থা খুব একটা গতিশীল না হলেও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে জারিগানের ঐতিহ্য এখনো নিজস্ব সকীয়তায় দীপ্তি ছড়াচ্ছে। "প্রতিবছর মহররমের সময় ওইসব অঞ্চলের মুসলমান জনগোষ্ঠী জারি ভক্তদের অন্তরাত্মার ক্রন্দন জাগাতে সক্ষম হয়।"[২৬]

আলোকচিত্র- ৮ : জারিগানের পরিবেশনা

২.২.৪. গাজীর গান

বাংলায় সকল পূজ্য পীরদের মধ্যে গাজী পীরের প্রভাবই ব্যাপকতর। ভারত-বাংলাদেশ উভয় দেশেই গাজীর গানের বেশ সমাদর রয়েছে। গাজীর গান এদেশের লোকায়ত মুসলমান পীর ও তাদের কাল্পনিক জীবনী নির্ভর আখ্যাধর্মী বৈচিত্র্যপূর্ণ পরিবেশনা। গ্রামের সাধারণ মুসলমান সমাজে নানা ধরণের রোগ-বালাই, বিপদ-আপদ, কামনা-বাসনা প্রাপ্তির আশায় পীরদের প্রতি অন্ধবিশ্বাস স্থাপন করে। আর এই নানা ধরণের মানত উপলক্ষ্য করেও গাজীর গানের আয়োজন দেখতে পাওয়া যায়। "বড় খাঁ গাজী ঐতিহাসিক ব্যক্তি বলে কোন কোন ব্যক্তি মনে করেন। 'রায়মঙ্গল'-এ রায় গাজীর ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে বলে মনে করা হয়ে থাকে।"[২৭] সাধারণ খেটে খাওয়া মুসলমানগণ এর পৃষ্ঠপোষক। সাধারণত দুই হাজার টাকা থেকে পাঁচ কিংবা তারও বেশি টাকায় গাজীর গানের দল বায়না করা হয়ে থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে বায়না ছাড়াও গাজীর গান পরিবেশিত হয়।

পরিবেশনার সময়

বিভিন্ন জেলায় নানা উদ্দেশ্যে গাজীর গান পরিবেশিত হয়ে থাকে। গাজীর গানের পরিবেশনায় কোন কোন অঞ্চলে ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। "কোন অঞ্চলে ৪টি পালা, আবার কোথাও ৭টি স্বতন্ত্র পালায় এ ধরণের ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারার আয়োজন করা হয়। তবে, বছরের যে কোন সময় গাজীর গানের আয়োজন হয়ে থকে।"[২৮]

মঞ্চের অবস্থান

গাজীর গানের অভিনয় স্থান হিসেবে গ্রামের বটতলা, খোলা স্থান, পুরানো হাট-বাজার স্কুল প্রাঙ্গন, এমনকি বাড়ির ভিতর কিংবা বাইরের প্রাঙ্গন ব্যবহার করা হয়ে থাকে। দশ থেকে বারো ফুটের বর্গাকারে মঞ্চ তৈরি করা হয়। দর্শকদের অবস্থান চতুর্দিকে তবে বর্গাকারে। মঞ্চের ঠিক উপরে টিনের চালা বা সামিয়ানা দ্বারা ছাউনির ব্যবহার দেখা যায়। মূল গায়েন ছাড়াও অন্যান্য শিল্পীদের ও বাদকদের জন্য ধানের খড়, চট বা বিছানার চাদর ব্যবহার করা হয়। তবে অভিনয় স্থানের মেঝে সচরাচর পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করা থাকে।

আলোকসজ্জা

দিনের বেলায় গাজীর গান পরিবেশিত হলে আলোর আলাদা ব্যবস্থার প্রয়োজন হয় না। তবে রাতের বেলা এ ধারার আখ্যানধর্মী নাট্য পরিবেশনে বর্তমানে বিদ্যুতের ব্যবহার চোখে পড়ার মতো। যদিও পূর্বে হ্যারিকেন ও হ্যাজাক বাতির ব্যবহার ছিল।

সাজঘর : গাজীর গানের পরিবেশনার জন্য কুশিলবদের আলাদা কোন সাজসজ্জার ঘরের প্রয়োজন হয় না। যে স্থানে বা যে বাড়িতে গাজীর গানের আয়োজন করা হয় সেখানে কোন একটি জায়গা তাদের সাজসজ্জার জন্য ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। কালু চরিত্র ছাড়া অন্যান্য চরিত্রে যারা ভূমিকা পালন করেন তারা সাধারণত ক্রেপ, নকল চুল, দাড়ি, জিঙ্ক অক্সাইড, লিপস্টিক, কাজল, পানি, সরিষার তেল ব্যবহার করেন।

পোশাকের ব্যবহার

গাজীর গান পরিবেশনায় বাদ্যযন্ত্রীদের পোশাকের ব্যাপারে কোন বিধিনিষেধ নেই। তবে প্রধান চরিত্র গাজীর অভিনয়ের ক্ষেত্রে মূল গায়েনের পরিবর্তে চরিত্রের জন্য পোশাক পরিবর্তনের দরকার হয় না। সাধারণত পাঞ্জাবি, পায়জামা ও টুপির ব্যবহার দেখার যায়। এছাড়া সহশিল্পীদের সাদা গেঞ্জি বা ফতুয়া ও চেক লুঙ্গির ব্যবহার লক্ষ্য

করা যায়। “রায়মঙ্গলে বর্ণিত ঈশ্বরের মূর্তির অনুরূপ গাজীর গানে গায়েন-অভিনেতাদের পোশাকে হিন্দু-মুসলমানি পোশাকের সমন্বয় থাকে।”[২৯]

বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার

গাজীর গান পরিবেশনে সাধারণত জুরি (প্রেম-জুরি), করতাল, ঢোল, বাঁশি, নূপুর বা ঘুঙ্গুর ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তবে, “গাজীর গানে সাধারণত বাদ্যযন্ত্র হিসেবে ঝাঁঝ, ছোট আকারের ঢোল বা ঢোলক, খোল ও মন্দিরা ব্যবহার করা হয়ে থাকে।”[৩০]

অভিনয় উপকরণ

গাজীর গানের পরিবেশনায় অভিনয় উপকরণ হিসেবে মূল গায়েনের পাশাপাশি অন্যান্য সকল চরিত্রে অভিনেতাগণ বিভন্ন ধরনের পোশাক ব্যবহার করে থাকেন। “অভিনয় উপকরণ হিসেবে গামছা, পুঁথির মালা, লাঠি, চামর, স্কার্ফ বা ওরনা, কাপড়ের থলে, এমনকি বাঘের মুখোশের ব্যবহার করা হয়ে থাকে।”[৩১]

গাজীর গানের পরিবেশনারীতি

গাজীর গানের পরিবেশনায় শুরুতেই বাদ্যযন্ত্রের সম্মিলিত বাজনা বা কনসার্ট করা হয়ে থাকে মূলত দর্শকদের একীভূত করার লক্ষ্যে। ভক্তিমূলক সংগীত পরিবেশন ও পীরের নামের বন্দনা করার পরে পরিচয় তুলে ধরা হয়ে থাকে। মূল গায়েনের আখ্যান বর্ণনাত্মক ও সংলাপাত্মক অভিনয়ের মাধ্যমে শুরু হলেও ছুকরীর নৃত্য (নারী চরিত্রে পুরুষের নৃত্য) পরিবেশন আলাদা এক আবহ তৈরি করে। বসে বা দাঁড়িয়ে মূল গায়েন তার সংলাপাত্মক অভিনয় করে থাকলেও মাঝে মাঝে ছুকরী বা সহ-অভিনেতাদের সংলাপাত্মক অভিনয়ে অংশগ্রহণের রীতি গাজীর গানে পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। দর্শকদের মনোরঞ্জনে হাস্যরসাত্মক ভাব ফুটিয়ে তুলতে সংলাপাত্মক অভিনয় দেখা যায়। গাজীর গানের পরিবেশনায় মূল গায়েন বাদ্যযন্ত্রীদের ইশারার মাধ্যমে তাল নিয়ন্ত্রণে রেখে গীত থেকে গদ্য অভিনয়ে কিংবা গীত থেকে আখ্যান বর্ণনা করে গীতাভিনয় উপস্থাপন করে থাকেন। হারমোনিয়ামের কোন একটি নির্দিষ্ট স্বরগ্রামে মূল গায়েন সুর মিলিয়ে পুরো পরিবেশনা করে থাকেন। এ গান পরিবেশনে বর্ণনাত্মক অভিনয় থেকে সংলাপাত্মক অভিনয় পরিবর্তনে বর্ণনাত্মক গদ্যের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। মূল গায়েন এক বা একাধিক চরিত্রের এবং দৃশ্যের বর্ণনা কালেই দোহার বা বাদ্যযন্ত্রীদের বৃত্তাকারে বসে সংলাপাত্মক চরিত্রে অভিনয়ের প্রস্তুতি লক্ষ্য করা যায়।

গাজীর গানে মূল গায়েন প্রথমে গদ্য চরিত্রটি বর্ণনা করেন। এসময় বাদ্যযন্ত্রীদের ভেতর অবস্থান করা কোন একজন ছুকরী মূল গায়েনের সঙ্গে সমবেত কণ্ঠ মিলিয়ে গীতাভিনয় করতে থাকলে একসময় মূল গায়েন বিশ্রামের উদ্দেশ্যে সহ-অভিনেতাদের মাঝে বসে পড়েন। ঠিক এ সময়ে ছুকরী গীতাভিনয়ের মাধ্যমে চরিত্রের বর্ণনাত্মক অভিনয়ের পরিবেশনা উপস্থাপন করে থাকেন।

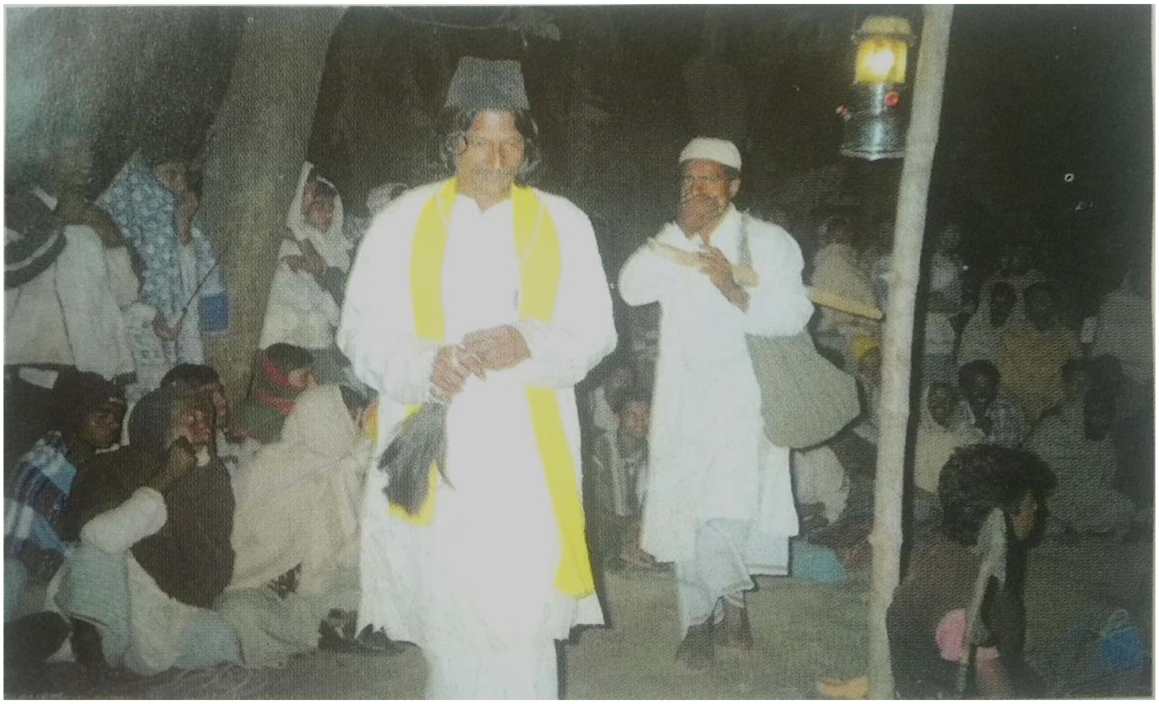

আলোকচিত্র- ৯ : গাজীর গান

গাজীর গানের শিল্পীর বর্তমান অবস্থা

গাজীর গানের অধিকাংশ শিল্পী বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত। গাজীর গানের শিল্পীগণ জীবন ও জীবিকার তাগিদে এবং পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে কৃষি, ক্ষুদ্র ব্যবসার সাথে জড়িত হয়ে পড়েন। “বৃহত্তর যশোর ও খুলনা অঞ্চলে গাজীর গান পরিবেশনে কিছুটা ব্যতিক্রম লক্ষ করা যায়। নারী ও পুরুষের অংশগ্রহণে এ অঞ্চলে গাজীর গানের পেশাভিত্তিক কিছু দল থাকলেও আধা পেশাজীবী গাজীর গানের দল রয়েছে।[৩২]

২.২.৫. মাদার পীরের গান

মাদার পীরের গান এদেশের মুসলমানদের লৌকিক পীরবাদের আখ্যানধর্মী এক জনপ্রিয় পরিবেশনা। মাদার পীরের আখ্যানধর্মী নাট্য পরিবেশনা বছরের বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। "অগ্নি-নির্বাপণকারী পীর হিসেবে মাদার পীরকে বিবেচনা করা হয়ে থাকে।"[৩৩]

পরিবেশনার সময়

লৌকিক পীরের আখ্যান কোন না কোনভাবে মানত উপলক্ষ্যে বিশেষ করে শীতকালে বেশি আয়োজন করতে দেখা যায়। মাদার পীরের আখ্যানধর্মী পরিবেশনা রাতে কিংবা দিনে যে কোন সময়ে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

আসরের অবস্থান

মাদার পীরের গান পরিবেশনার জন্য বাড়ির ভিতরে কিংবা বাইরে ১০, ১২ অথবা ১৪ ফুটের বর্গাকার ভূমি সমতল মঞ্চ তৈরি করা হয়। চার কোণে চারটি কলাগাছ পুঁতে বা খুঁটি গেরে উপরে কাপড়, টিন বা ছামিয়ানা টানানো হয়ে থাকে। মেঝেতে বসার জন্য বিছানার চাদর, মাদুর বা চটের ব্যবহার লক্ষ্যণীয়। মঞ্চের মাঝে বৃত্ত করে কুশিলবদের অবস্থান ও চতুর্দিকে দর্শকগণ খড়ের মধ্যে বা চটি বিছানো আসরে বসে মাদার পীরের গান উপভোগ করে থাকেন।

আলোর ব্যবস্থা

রাতের বেলা মাদার পীরের পরিবেশনার জন্য পূর্বে হ্যারিকেন বা হ্যাজাক বাতির ব্যবহার থাকলেও বর্তমানে বৈদ্যুতিক বাতি এমনকি এর বিকল্পস্বরূপ জেনারেটর ব্যবহারের প্রচলন বেশ লক্ষ্যণীয়।

সাজসজ্জার ঘর

মাদার পীরের পরিবেশনার জন্য সাজঘর হিসেবে আয়োজক বাড়ির কোন একটি কক্ষ বা বারান্দা ব্যবহারের প্রচলন রয়েছে। মূল গায়েন ও নৃত্য পরিবেশনকারীদের তেমন কোন সাজসজ্জা দেখা যায় না। মুখে হালকা জিংক-অক্সাইড ব্যবহার, সরিষার তেল কিংবা নারিকেল তেল, পানি, কাজল, জরির ব্যবহার, স্নো-পাউডার, নৃত্যশিল্পীদের নাক, কান ও গলায় বিচিত্র অলংকারের ব্যবহার ও বিভিন্ন রঙের পুঁতির মালা ব্যবহার করতে দেখা যায়।

পোশাকের ব্যবহার

মাদার পীরের গান পরিবেশনায় মূল গায়েনসহ অন্যান্য শিল্পীদের বিভিন্ন ধরনের পোশাক ব্যবহার করতে দেখ যায়। মাদার পীরের গান পরিবেশনায় মূলত লাল বা খয়েরি রঙের কাপড়ের বেশি প্রাধান্য। তবে, এ গান পরিবেশনার ক্ষেত্রে বিবিন্ন পোশাকের মধ্যে–"বিশেষ ধরণের ধুতি, ওরনা, খিলকা, ধূতি পাজামা, রঙ্গিন ব্লাউজ, একই রঙ্গের কাপড়, প্লাস্টিকের তৈরি মুকুট, আলখেল্লা, শাড়ি (সুতির বা জর্জেটের) ইত্যাদি পোশাকের ব্যবহার হয়ে থাকে।"[৩৪]

বাদ্যযন্ত্র

মাদার পীরের গানে বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার এক বিশেষ আবহ তৈরি করে। বাদ্যযন্ত্র হিসেবে করতাল, জুরি, খোল, ঝাঁঝ ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

মাদার পীরের গানের পরিবেশনারীতি

ঐতিহ্যবাহী এ নাট্যধারার পরিবেশনায় বর্ণনাত্মক ও সংলাপাত্মক অভিনয়ের মিশ্র প্রয়োগে মূল গায়েন একমাত্র মূখ্য ভূমিকা পালন করেন। কনসার্টের মধ্যদিয়ে পরিবেশনা শুরু হয়ে থাকে। সালাম জানিয়ে সাধারণত করতাল ও খোল বাদ্যের তালে তালে বন্দনা করা হয়। যেমন-

"এক অক্ষর দুই অক্ষর যে জ্যানে কালাম,
তিনার চরণে আমার হাজার সালাম।
এক অক্ষর দুই অক্ষর যে শিকালো মোরে
ভক্তিভাবে তাহার চরণ আমার মস্তকের উপরে।
আমি অধম দশের কদম, বাবা সগোল কিছু নাহি জানি
কেবল ভরসা আমার দশের আঙা চরণখানি।
দীক্ষা গুরু বন্দে গাবো শিক্ষা গুরুর পা
গানের গুরু বন্দে গাবো স্বরসাতি মা।
দেশ মাতা জ্ঞান দাতা শিক্ষারও প্রধান
তোমার সাধনা করছে মাগো হিন্দু মুসলমান ॥"[৩৫]

তবে এ ধরণের বন্দনা গীতের ক্ষেত্রে প্রতি ছয় কিংবা আটচরণ পরে সমন্বিত বাদ্যযন্ত্রের সাথে ধুয়া অংশ পরিবেশন করা হয়ে থাকে। মাদার পীরের আখ্যান পরিবেশনায় মূল গায়েনকে গীত- সংলাপাত্মক পদ্য ও গদ্যের ব্যবহার করতে দেখা গেলেও মূল গায়েন মাদার এবং শেরশাহ বাদশার চরিত্রে সংলাপাত্মক অভিনয় করে থাকেন।

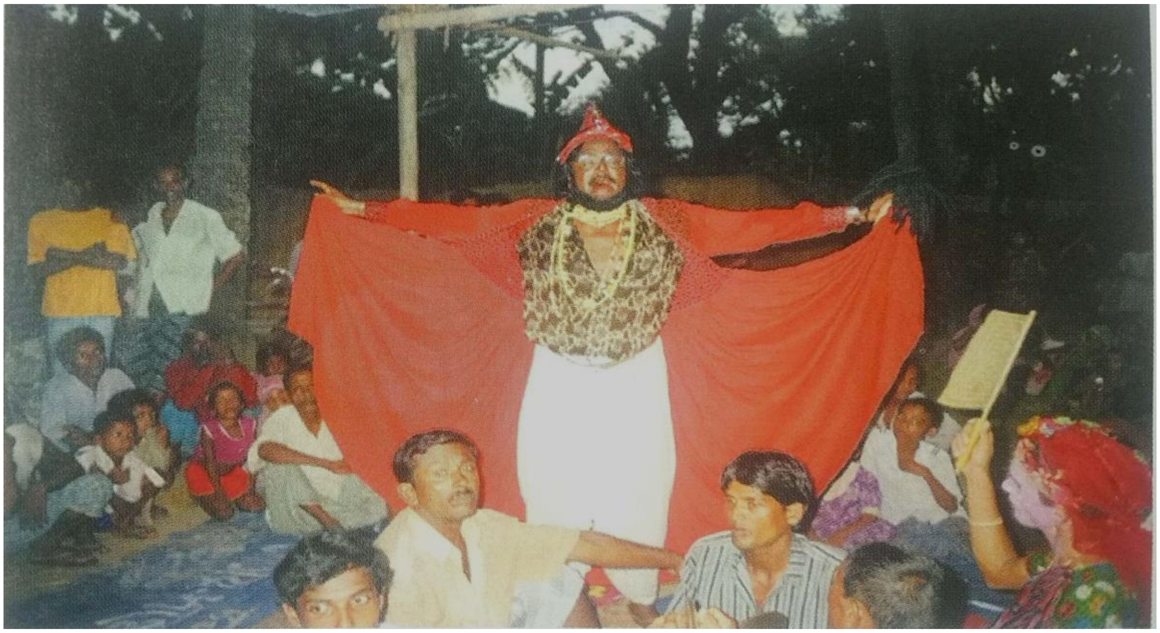

আলোকচিত্র- ১০ : মাদার পীরের গান

কুশিলবদের বর্তমান অবস্থা : মাদার পীরের গান রাজশাহী ও নাটোর জেলায় বেশি প্রচলিত। তবে, এদেশের অন্যান্য অঞ্চলেও এর প্রচলন রয়েছে। তবে, নাটোর অঞ্চলে প্রসিদ্ধ গায়কের বসবাসের উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলেও মাদার পীরের বেশ কিছু দল রয়েছে এবং বিভিন্ন ধারার পরিবেশনা লক্ষ্য করা যায়।

২.২.৬. কবিগান

বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী লোকনাট্য হিসেবে উদার জ্ঞানতত্ত্বমূলক আখ্যানধর্মী প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশনা হলো কবিগান। কবিগানের দলনেতা কে কবিয়াল সরকার নামে অভিহিত করা হয়। এ ধরণের পরিবেশনা দুটো দলের মধ্যে প্রশ্নোত্তর পালার মধ্যদিয়ে পরিবেশিত হয়ে থাকে।

কবি গানের উদ্ভব ও বিকাশ : কবিগান মধ্যযুগের শেষার্ধে আবির্ভূত হলেও আধুনিক যগের গোড়ার দিকে পল্লীবঙ্গে সাড়া ফেলতে শুরু করে। "কবিগানের মধ্যে স্থান লাভ করে সমকালের এবং পূর্ববর্তী কালের বঙ্গীয় সঙ্গীত ঐতিহ্যের প্রায় সব শাখাই। বাংলার লোকসংস্কৃতিতে কবিগান হলো লোকজীবন ও নাগরিক জীবনের ঐতিহ্যময় সমন্বিত রূপ।"[৩৬]

কবিগান পরিবেশনের সময় : সাধারণত সন্ধ্যা থেকে ভোর রাত পর্যন্ত কবিগানের আসর হয়ে থাকে। তবে শীতকালে কবি গানের আয়োজন দীর্ঘদিন যাবৎ হয়ে আসছে। এছাড়া, বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান কেন্দ্রিক কবি গানের পরিবেশনা হয়ে থাকে।

কবিগানের আসর : কবি গানের পরিবেশনার জন্য বিশেষ কোন মঞ্চ তৈরির প্রয়োজন হয় না। খোলা জায়গায় কিংবা বাড়ির উঠানেও কবিগানের পরিবেশনা হয়ে থাকে। দর্শকদের মাঝখানে কবিয়াল, দোহার ও বাদ্যযন্ত্রশিল্পী অবস্থান করে এর পরিবেশনা করে থাকে। তবে টিনের ছাউনি বা ছামিয়ানা টানানোর রীতি প্রচলিত।

কবিগানে আলোর ব্যবস্থা : কবিগানের পরিবেশনা সারারাত অবধি হয়ে থাকে বলে এর জন্য বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা করা হয়। বিকল্প হিসেবে আজকাল জেনারেটর ব্যবহারের প্রচলন রয়েছে।

সাজসজ্জা : কবি গানে কবিয়াল বা সাধারণত পাঞ্জাবি, পায়জামা বা লুঙ্গি পরিধান করে। সাজসজ্জার কোন আলাদা ব্যবস্থার প্রয়োজন হয় না।

পোশাকের ব্যবহার : কবিগানের শিল্পীদের বেশিরভাগ সময়ে সাধারণ প্যান্ট-শার্ট কিংবা ফতুয়া পড়ে পরিবেশন করে থাকেন। তবে সাদা পাঞ্জাবি, পায়জামা বা ধুতি, লুঙ্গি, ফতুয়া ব্যবহারের প্রচলন রয়েছে।

বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার : কবিগানের পরিবেশনার জন্য ঢোল, বাঁশি, হারমোনিয়াম, মন্দিরা, করতাল, জিপসী, জরির ব্যবহার রয়েছে।

পরিবেশনারীতি

কবিগানের ক্ষেত্রে দুটি ডাক বা বন্দনা শেষে কবিয়ালদ্বয় আসরে আসন গ্রহণ করেন। কবিগানে দুই পক্ষের কবিয়ালের মধ্যে মূল পর্ব শুরু করেন প্রথম পক্ষের কবিয়াল ও তার দুই সহযোগী টপ্পা পরিবেশনের মধ্য দিয়ে। টপ্পা পরিবেশনের পর কবিয়াল 'পাড়ন' শুরু করে দেন। আর ধুয়াগীতের মধ্যদিয়ে পাড়নের বিষয়কে নাটকীয় রূপ দেওয়া হয়ে থাকে। এরপর পয়ার ছন্দ কথনের সমাপ্তির পর প্রথমপক্ষ বসে পড়েন।

এবার প্রতিপক্ষের কবিয়াল নাটকীয় ভঙ্গিমায় প্রথম পক্ষের কবিয়ালের পাড়নের প্রত্যুত্তর করে একটি তত্ত্বমূলক গান পরিবেশন করেন। এবার প্রতিপক্ষের কবিয়াল প্রথম পক্ষের কবিয়ালের জন্য প্রশ্ন ছুড়েন। প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েই বসে পড়েন। "দুই কবিয়ালের নাটকীয় উপস্থাপনায় ধরন, পাড়ন, ফুকার, মিশ, মুখ, পেঁচ, খোচ, দ্বিতীয় ফুকার, দ্বিতীয় মিশ, মুখ, অন্তরা দ্বিতীয় চিতাল/পাড়ন, তৃতীয় ফুকার, তৃতীয় মিশ ইত্যাদি পথের ভেতর দিয়ে এক সময় কবিগানের আসরের সমাপ্তি ঘটে থাকে।৩৭

কবিগান ও কবিয়ালদের বর্তমান অবস্থা : বর্তমান সময়ে বাংলাদেশে বিভিন্ন অঞ্চলে বেশ কিছু কবিয়াল এই ঐতিহ্যবাহী কবিগান গেয়ে বা পরিবেশন করে কবি গানের প্রচার এবং প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে চলেছেন।

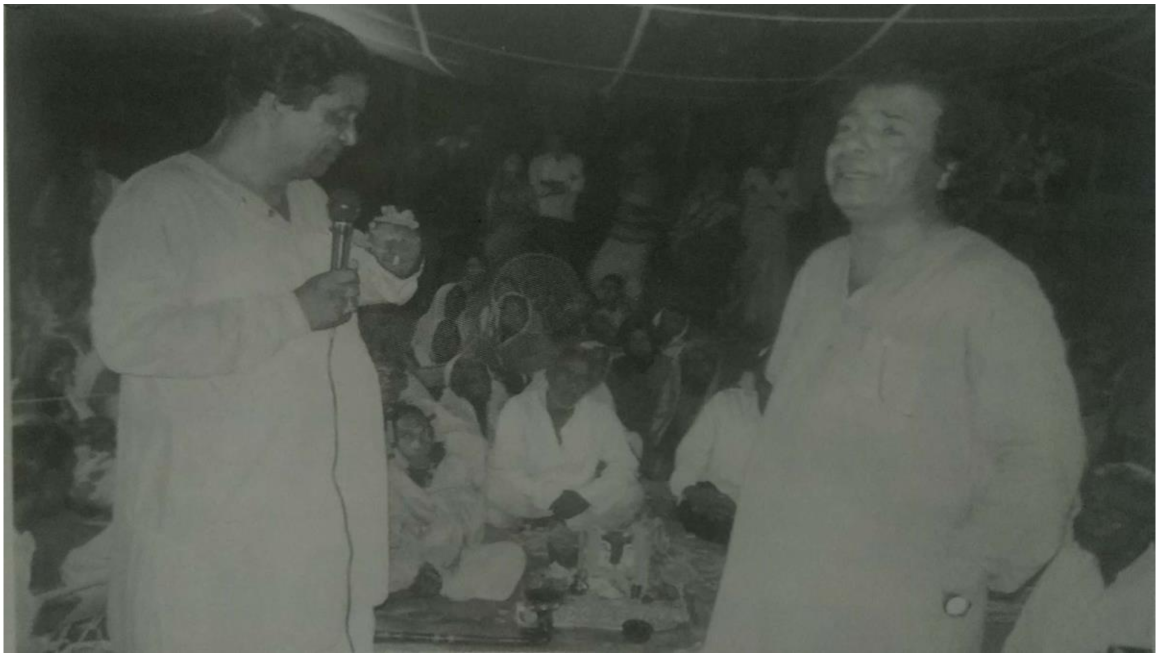

আলোকচিত্র- ১১ : কবিগানের আসরে দুই কবি

২.২.৭. গম্ভীরা গান

গম্ভীরা রাজশাহী ও চাপাইনবাবগঞ্জ অঞ্চলের অতি জনপ্রিয় লোকনাট্য হিসেবে সর্বজনবিদিত এক ঐতিহ্যবাহী ধারা। তবে দেশের অন্যান্য অঞ্চলেও গম্ভীরা পরিবেশন করতে দেখা যায়। সমসাময়িক নানা অসঙ্গতি এর বিষয়বস্তু হিসেবে অন্তর্ভুক্ত।

উদ্ভব : গম্ভীরা গানের উৎস মূলত 'বর্ষ বিবরণী' থেকে এরূপ ধারণা রয়েছে। সারা বছরের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বা সমস্য এত খুব সুচারুভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়। "তবে, মধ্যযুগের ব্যাঙ্গধর্মী গীতিনাট্য হিসেবে সঙ পরিবেশনারীতি বিবর্তনের ধারায় পূজা উৎসব হিসেবেই গম্ভীরা গানের উৎপত্তি বলে গবেষকদের ধারণা।"[৩৮]

গম্ভীরা গানের মঞ্চ : গম্ভীরা গানের পরিবেশনকারীরা গোলাকার হয়ে বৃত্তাকারে অবস্থান নিয়ে একপাশে যন্ত্রীদের রেখে উন্মুক্ত স্থানে ছামিয়ানাযুক্ত মঞ্চে এই ঐতিহ্যবাহী পরিবেশনা উপস্থাপন করে থাকেন। দর্শকেরা সাধারণত মঞ্চের চতুর্দিকে গোলাকার হয়ে আসন গ্রহণ করে ঐতিহ্যবাহী মনোরোগ্য পরিবেশনা উপভোগ করে থাকেন।

সাজসজ্জার ঘর : ঐতিহ্যবাহী গম্ভীরা গানের কুশীলব পরিবেশনার পূর্বে তেমন কোন বিশেষ সাজসজ্জার প্রয়োজন হয় না। তবুও কোন কোন গম্ভীরা গানের জন্য নির্ধারিত মূল মঞ্চের কাছেই অস্থায়ী সাজঘরের ব্যবস্থা থাকে।

ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্র : গম্ভীরা গান পরিবেশনে বাদ্যযন্ত্র হিসেবে পূর্বে কাসি ও ঢোলের ব্যবহার হলেও বর্তমানে তবলা, বাঁশি, হারমোনিয়াম, জুরি ও মন্দিরা ব্যবহার বিশেষ আবহ তৈরি করে।

পোশাক : গম্ভীরা গানের পরিবেশনে কুশিলবদের প্যান্ট, লুঙ্গি, গামছা, স্যান্ডো গেঞ্জি এমনকি হাফ প্যান্টও পরিধান করার বেশ প্রচলন রয়েছে। বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষের পেশা কৃষির প্রতীকী মাথাল মাথায় দেওয়া নানা-নাতী দুটো চরিত্রের জন্য অত্যাবশ্যক। নানা চরিত্র হিসেবে লুঙ্গি, স্যান্ডোগেঞ্জি এবং কোমরে গামছা বাঁধার রীতি পরিবেশনার ব্যতিক্রমধর্মী আবহ তৈরি করে থাকে।

অভিনয় উপকরণ : গম্ভীরা গানে লাঠি, খাতা, পায়ের জন্য নূপুর বা ঘুঙ্গুর ব্যবহার করা হয়। এ পরিবেশনার জন্য তেমন কোন বিশেষ উপকরণ প্রয়োজন হয় না।

পরিবেশনারীতি

গম্ভীরা গানের পরিবেশনার সাথে আলকাপ গানের পরিবেশনার বেশ সাদৃশ্য রয়েছে। গান, সংলাপ ও অভিনয়ের এক মিশ্র জনপ্রিয় পরিবেশনা গম্ভীরা গান। নৃত্যাভিনয় সহযোগে দোহারগণ গম্ভীরা গানের ধুয়া পরিবেশন করে থাকেন। এমনকি গম্ভীরায় শিবের বন্দনা খুব চমৎকারভাবে উপস্তাপন করা হয়ে থাকে। এদেশে প্রচলিত গম্ভীরা গানে শিবকে তুষ্ট করার জন্য ভক্তের নিবেদন নিম্নরূপঃ

"শিব, মনের কথা দু'টো বলিব
এনে জড় জগতে, ঘুরাও নানা পথে,

কোথা গেলে দেখা পাইব।
পড়ে শুনে শিখি শুধু তুমি বিশ্বেশ্বর,
বচন আউড়াতে আমি হয়েছি খুব দড়,
ভুলে গেছি তব পূজা, তাই আমরা পাচ্ছি সাজা
দুঃখের কথা কারে কহিব।
ধর্মের সার গেছে কাল-স্রোতে ভেসে
সংস্কার রয়েছে এ পোড়া দেশে
বল পুণঃ কিসে ধর্ম ফিরে আসে
সে উপায় আমরা শিখিব।
নিজ নিজ স্বার্থ হল ধর্ম কর্ম
এই কি শিব, তোমার সনাতন ধর্ম,
বুঝে দেশের মর্ম করিব সে কর্ম
খাঁটি কর্মী এবার হইব।
ত্যাগীবেশে তুমি এসে এই গম্ভীরায়
মনসাধে পুঁজি মোরা, ভাইবোন সবাই
হায়, একি হ'ল দায়, নিজে ত্যাগী হতে নাহি চায়,
এ ছলনা আমরা ছাড়িব ॥"[৩৯]

শিল্পীদের বর্তমান অবস্থা : দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গম্ভীরা গানের দল রয়েছে। তবে, জনপ্রিয়তার কারণেই চাপাইনবাবগঞ্জ জেলার গম্ভীরা দলের পরিবেশনা বেশ সক্রিয়। রাজশাহী, নাটোর ও নওগাঁ জেলার বেশ কিছু গম্ভীরা গানের জন্য বিশেষ কোন উৎসবের দরকার হয় না। যেকোন সামাজিক বিষয় নিয়ে গম্ভীরার পরিবেশনা হয়ে থাকে।

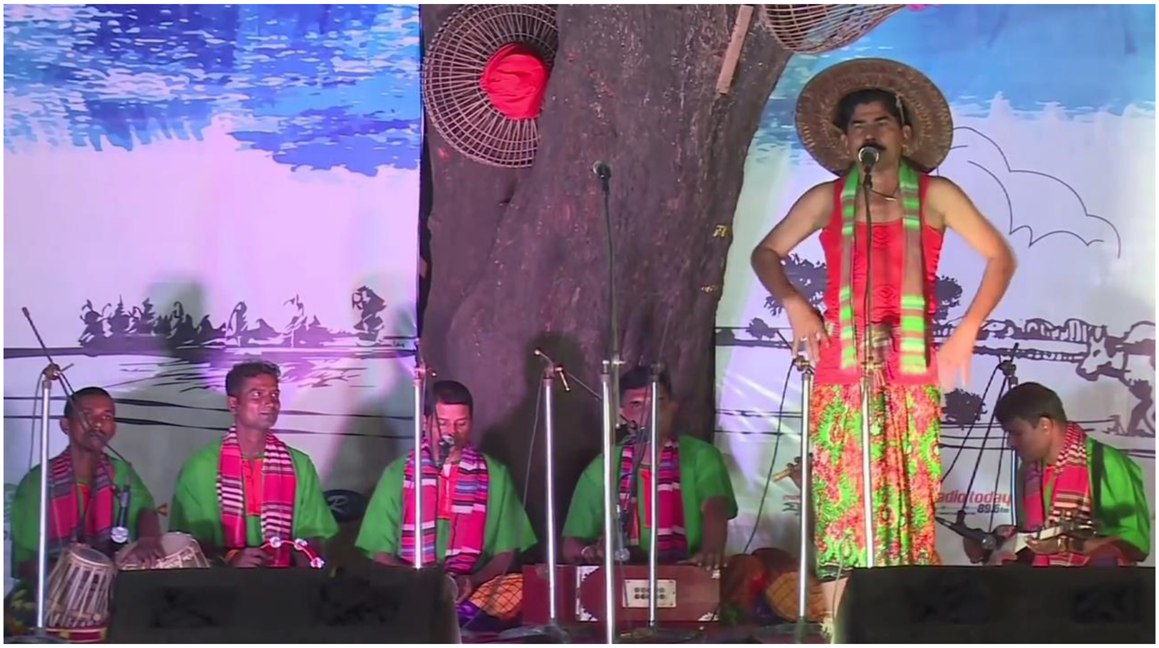
radio today 89.6

আলোকচিত্র- ১২ : গম্ভীরা গানে পোশাকের ব্যবহার

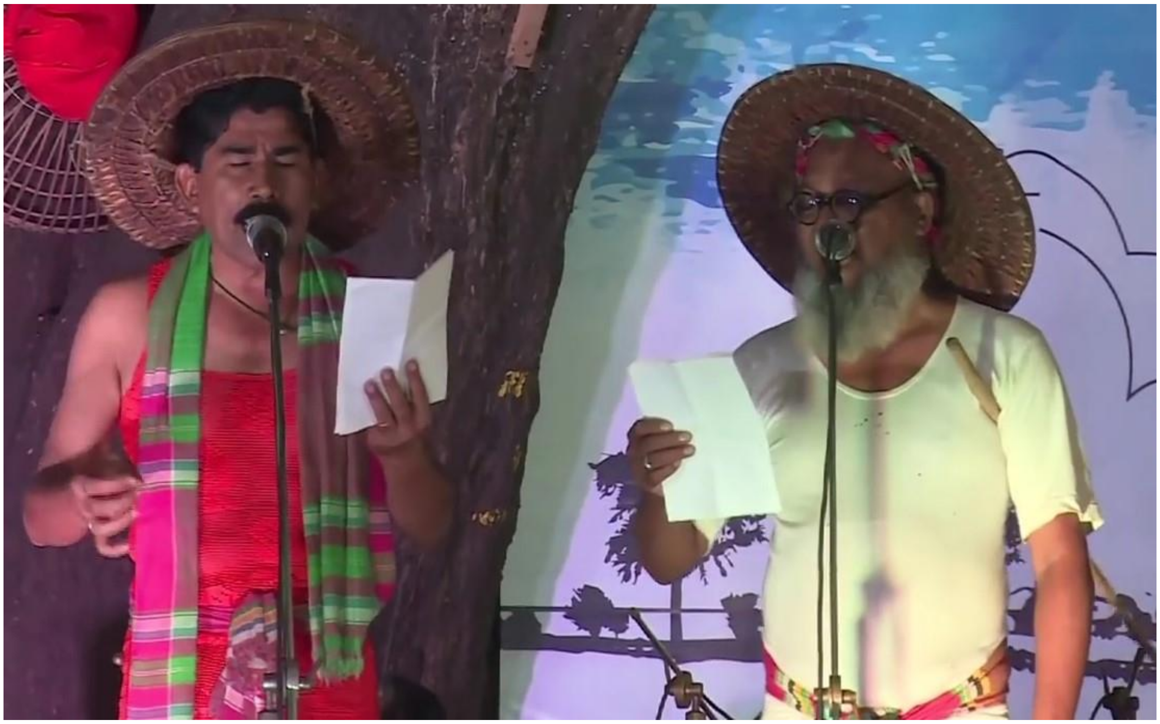

আলোকচিত্র- ১৩ : গম্ভীরা গানের পরিবেশনারীতি

২.২.৮. আলকাপ গান

বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারায় একটি জনপ্রিয় লোকনাট্য হিসেবে বিবেচিত বৃহত্তর রাজশাহী অঞ্চলের ‘আলকাপ’ গান। যদিও চাপাইনবাবগঞ্জ জেলায় এর প্রচলন বেশি দেখা যায় তবে নাটোর, নওগাঁ পর্যন্ত এর বিস্তৃতি রয়েছে। বাংলার গ্রামীণ মানুষের পারিবারিক জীবনচিত্র খুবই সুচারুভাবে ফুটিয়ে তোলা হয় ঐতিহ্যবাহী লোকনাট্য ‘আলকাপ’ গানে।

আলকাপ গানের উদ্ভব ও বিকাশ : আলকাপ মূলত রঙ্গরসিকতা তথা হাস্যরসাত্বক নাট্য পরিবেশনা। নাট্যপালারূপেই প্রচলিত রয়েছে। “তবে, বৃহত্তর রাজশাহী জেলার সীমান্তবর্তী পার্শ্ববর্তী বন্ধুরাষ্ট্র ভারতের বীরভূম ও পশ্চিমবঙ্গে এ পরিবেশনা হলো ছ্যাচড়া বা পাঁচমিশালী পরিবেশনা।”[৪০] আবার ‘আলকাপ’ শব্দটির ব্যাখ্যা নানাভাবে পাওয়া যায়। “আল মানে সীমানা (জমির আল), আর আলকাটা কাপ মানে সীমাহীন হাসি-তামাশা বা অসংযত রঙ্গ-রসিকতা। সব মিলিয়ে আলকাপকে তাই কৌতুক বা হাস্যরসাত্মক পরিবেশনারীতি হিসেবে অভিহিত করা যায়।”[৪১] নানা ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসব উপলক্ষ্যে আলকাপ গানের পরিবেশনা হয়ে থাকে।

দলের বায়নামা : আলকাপ গানের পরিবেশনার জন্য দুই হাজার থেকে প্রায় দশ হাজার টাকা পর্যন্ত বায়নামা দিয়ে দল ঠিক করা হয়। অর্থের পরিমাণ কম-বেশি হয়ে থাকে। গ্রামের সাধারণ মানুষই আলকাপ গানের মূল পৃষ্ঠপোষক।

আলকাপ পরিবেশনার সময় : বাংলাদেশের মানুষ সংস্কৃতিপ্রেমী। বছরের বিভিন্ন উৎসব ও লোকমেলা উপলক্ষে অন্যান্য আয়োজনের পাশাপাশি ঐহিত্যবাহী লোকনাট্য আয়োজন করতে দেখা যায়। আলকাপ গান নির্দিষ্ট কোন উৎসবকেন্দ্রিক নয় বরং তা সার্বজনীন পরিবেশনারীতি হিসেবে যেকোন সময়ে যেকোন ঋতুতে পরিবেশিত হতে দেখা যায়। সাধারণত সারারাতব্যাপী আলকাপ গানের পরিবেশনা হয়ে থাকে।

মঞ্চ বা আসর : আলকাপের আসর বা মঞ্চ সাধারণত খুব বেশি উঁচু হয় না। “ভূমি-সমতলে গোলাকার মঞ্চে দর্শকদের গোলকার অবস্থানের মাঝের ফাঁকা অংশে সরকার, অভিনেতা, খেমটাওয়ালী বাদ্যযন্ত্রীরা বসেন এবং এ স্থান থেকে উঠে দাড়িয়েই নাটকের কুশিলবরা তাদের চরিত্রায়ন সমাপ্ত করে আবার দোহার দলে মিলিত হন।”[৪২]

মঞ্চের উপর কাপড় বা ছামিয়ানা বা টিনের চাল দেবার রীতি প্রচলিত। ভূমি সমতল কিংবা উঁচু চৌকি মাঝে মাঝে আলকাপের পরিবেশনায় দেখা যায়।

আলোর ব্যবস্থা : আলকাপ গানের পরিবেশনা বেশিরভাগ সময়ে রাতের বেলা হয়ে থাকে বলে আলোর ব্যবস্থা হিসেবে বর্তমানে বিদ্যুতের ব্যবহার বেশ জনপ্রিয়। তবে বিকল্প হিসেবে জেনারেটর বা হ্যাজাক বাতির ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

সাজসজ্জার ব্যবস্থা : আলকাপের পরিবেশনার জন্য নির্ধারিত মূল মঞ্চের আশেপাশে কাপড়ঘেরা দিয়ে কিংবা কোন বাড়ির একটি ঘর সাজঘর হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। রূপসজ্জার জন্য আলতা, স্নো, পাউডার, জরি, কাজল, লিপস্টিক, ফিতা, চুড়ি, মালা, সরিষা তেল, নারিকেল তেল, কানে, নাকে ও মাথায় ব্যবহারের অলংকার ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

পোশাকের ব্যবহার : আলকাপ গানে পুরুষ চরিত্রের পাশাপাশি নারী চরিত্রেও পুরুষদের অভিনয় করতে দেখা যায়। এক্ষেত্রে পুরুষরা পাঞ্জাবি, ধুতি, পায়জামা, লুঙ্গি পরিধান করলেও নারী চরিত্রাভীনয়ের জন্য শাড়ি, ব্লাউজ, ওরনা, গামছা ব্যবহার করা হয়।

অভিনয় উপকরণ : আলকাপ গানের আসরে একটি খাতা, চেয়ার, মন্দিরা, বাঁশি, গামছা ইত্যাদি অভিনয় উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্র : আলাকাপ গানে বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার এক ভিন্ন আবহ তৈরি করে। এতে ডুগি, জুরি, মন্দিরা, কোন কোন ক্ষেত্রে করতাল, হারমোনিয়াম, বাঁশি কিছু ক্ষেত্রে ক্যাসিও ব্যবহার করতে দেখা যায়।

পরিবেশনারীতি : আলকাপ পরিবেশনার শুরুতেই সমস্ত কুশিলব ও বাদ্যযন্ত্রী মঞ্চে বসে আসর গ্রহণ করে বাদ্যযন্ত্রের কনসার্ট শেষে 'জয় জয় তানসেন কি জয়, শিবনাথের সরস্বতীর জয়, বিশ্বনাথের জয়, সর্ব-দেবতাকে জয়, বাংলাদেশের জয় বলে বন্দনা শুরু হয়। বৈচিত্র্যপূর্ণ সুরে বন্দনা গীত শেষ করে যখন সরকার দোহারদের মাঝে বসে পড়েন তখন ছোকরা তার নৃত্যগীত নিয়ে হাজির হয়। সাধারণত গীতি, নৃত্য, ছন্দ বা ছড়ার তাৎক্ষণিক সৃজন প্রতিভা উপস্থাপনের সঙ্গে বর্ণনাত্মক ও সংলাপাত্মক অভিনয়ের আলকাপের পরিবেশনারীতিতে সুস্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ করা যায়। আলকাপ গানে শিব বন্দনা, গণেশ বন্দনা কার্তিক বন্দনার প্রচলন রয়েছে। আলকাপ গানের আসর সরস্বতী বন্দনা নিম্নরূপঃ

"বন্দি বীণাপানি, বিদ্যাদায়িনী
শ্বেত সরস্বতী, সরোজবাসিনী
কণ্ঠে দে মা সুর লহরী

যন্ত্রে দে মা শব্দ মাধুরী
চিত্তে জ্বেলে দে জ্ঞানের প্রদীপ
বক্ষে শক্তি, জ্ঞানদায়িনী
বন্দি বীণাপানি, বিদ্যাদায়িনী।
মন্দিরে তব আলোর বন্যা
বিশ্বমাতা স্বনাম ধন্যা
আমরা কয়জন করি নিবেদন
শ্রীচরণে রাখি মধুর বাণী।
বন্দি বীণাপানি বিদ্যাদায়িনী
শ্বেত সরস্বতী সরোজবাসিনী॥"[৪৩]

এভাবেই সংলাপ, সংগীত, অভিনয় ও নৃত্যের মিশ্রণে পারিবারিক নানা অসঙ্গতির চিত্রপট ফুটিয়ে তোলার মাধ্যমে আলকাপ গানের পরিবেশনা সম্পন্ন হয়ে থাকে।

আলকাপের শিল্পী-কুশিলবদের বর্তমান অবস্থা : চাঁপাইনবাবগঞ্জে আলকাপের ব্যাপক জনপ্রিয়তা থাকলেও রাজশাহী, দেশের অন্যান্য অঞ্চলে এর পরিবেশনা কদাচিৎ। পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে জনপ্রিয় এসকল ঐতিহ্যবাহী ধারা আজ বিলুপ্তির পথে। তবে, "নানা প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও বিখ্যাত কিছু আলকাপ গানের দল নাটোর ও রাজশাহী অঞ্চলে তাদের পরিবেশনার মাধ্যমে সুনাম কুড়িয়ে চলেছেন বলে জানা যায়।"[৪৪]

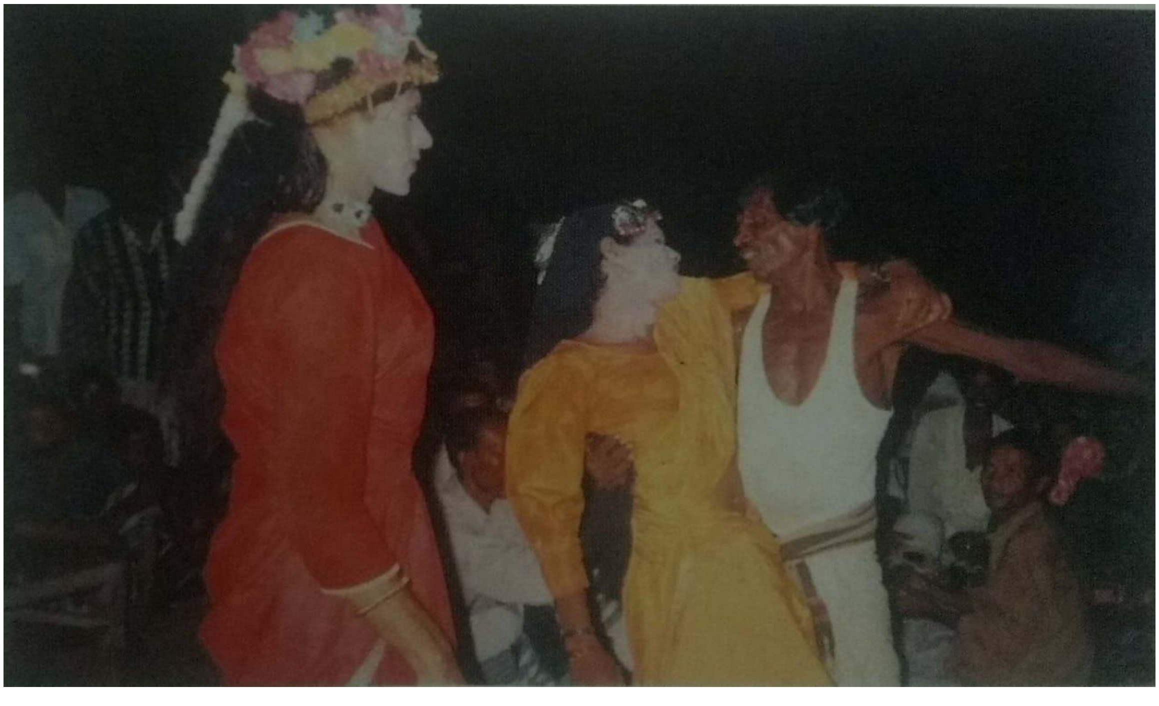

আলোকচিত্র-১৪ : আলকাপ গানের পরিবেশনা

২.২.৮. ধামাইল গান

বিষয়বস্তু : রাধা-কৃষ্ণের প্রেম কাহিনী ছাড়াও সমাজের নানা সামাজিক সমস্যা ধামাইল গানের বিষয়বস্তু হিসেবে ফুটিয়ে তোলা হয়। বাঙালির আধুনিক চিন্তার ফসল হিসেবে রাধাকৃষ্ণের প্রণয় উপাখ্যানকে উপজীব্য করে ধামাইল গানের পরিবেশনা অধিক জনপ্রিয়। তবে, "শুধুমাত্র রাধা-কৃষ্ণকে অবলম্বন করে এর পরিবেশনা সীমাবদ্ধ না থেকে বর্তমানে যৌতুক, নিরক্ষরতা, জন্মনিয়ন্ত্রণ, বৃক্ষরোপণ, মৎসচাষ, এসিড নিক্ষেপ, মাদকদ্রব্যসহ সমাজের নানা অসঙ্গতি তুলে ধরার মাধ্যমে এর পরিবেশনা অব্যাহত রয়েছে।"[৪৫]

পরিবেশনের স্থান : ধামাইল গান বিবাহ অনুষ্ঠান ছাড়াও অন্যান্য অনুষ্ঠানে বাড়ির উঠান, বারান্দা কিংবা খোলা জায়গায় ১০ থেকে অধিক নারী একত্রে গোল হয়ে নৃত্য-সহযোগ পরিবেশন করেন।

অঞ্চল : ধামাইল গান সিলেট বিভাগ ছাড়াও সিলেটের পার্শ্ববর্তী বেশ কয়েকটি জেলায় পরিবেশিত হতে দেখা যায়। তবে, বর্তমানে এই পরিবেশনা কমে গেছে পূর্বের তুলনায়।

ধামাইল গানের উপলক্ষ : ধামাইল গান রচনা ও পরিবেশনার মূল উপলক্ষ বিয়েকেন্দ্রিক- একথা অনস্বীকার্য। বিয়ের সময় বর-কনেকে সামনে রেখে ধামাইল গান নৃত্যসহযোগে পরিবেশিত হয়। এছাড়াও, "হিন্দু সম্প্রদায়ের শিশুদের অন্নপ্রাশন, অধিবাস, স্বাদভক্ষণ, গৃহপ্রবেশ, ধানকুটা, চিড়াকুটা, ঢেঁকিপাড়, পানিসেচা, শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমীসহ বিভিন্ন পূজাপার্বণে ধামাইল গান পরিবেশন করা হয়।"[৪৬]

প্রয়োজনীয় উপকরণ : বাংলাদেশের সিলেট অঞ্চলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধামাইল গান পরিবেশনের সময় সেখানে ঘি, ধান, ফুল, প্রদীপ, দুর্বা, কুলা, মাটি ইত্যাদি প্রয়োজনীয় উপাদান সাজিয়ে রাখার রীতি বেশ প্রচলিত। এছাড়াও, "পরিবেশনার উপকরণ হিসেবে বসার জন্য চেয়ার, স্নানের সামগ্রী হিসেবে লুঙ্গি, গামছা, সাবান, স্যান্ডো, গেঞ্জি, শার্ট, প্যান্ট ব্যবহারের রীতি দীর্ঘকালের।"[৪৭]

সাজসজ্জা : ধামাইল গানের পরিবেশনাকারীদের তেমন কোন সাজসজ্জার প্রয়োজন হয় না, এমনকি সাজঘর বলে বিশেষ কোন ব্যবস্থার দরকার হয় না। নিত্য ব্যবহার্য পোশাকেই বেশিরভাগ ধামাইলের পরিবেশনা হয়ে থাকে।

বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার : ধামাইল গানের পরিবেশনার জন্য বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার তেমন নেই বললেই চলে। তবে বর্তমানে ঢোলের ব্যবহার কোন কোন পরিবেশনায় লক্ষ্য করা যায়। এছাড়া, হাতে তালি সহযোগে এর পরিবেশনা এক ভিন্ন আবহ সৃষ্টি করে।

গানে সুরের প্রয়োগ : ধামাইল গানে সুরের বেশ বৈচিত্র্য রয়েছে। অঞ্চলভেদে সুরের পরিবর্তন বেশ লক্ষণীয়। "ধামাইল গানে মাধুরী, মেঘমালা, পূরবী, দ্বিপালী, ধামালী, মিতালীসহ বিভিন্ন লোক বা আঞ্চলিক সুরের প্রয়োগে ধামাইল গান পরিবেশিত হয়ে থাকে বলে 'বাংলাদেশের ধামাইল গান' নামক গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে।"[৪৮]

পরিবেশনারীতি

ধামাইল গানের শিল্পীদের ছন্দময় করতালির মাধ্যমে সম্মিলিত কণ্ঠের টানা সুর, তাল এবং লয়ের মিশ্রণে এ গান পরিবেশিত হয়। তবে, ধামাইল গান গাওয়ার সময় বর ও কনেকে কেন্দ্র করে শিল্পীরা গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আবহ সৃষ্টি করে। এসময় তাদের পরিবেশনার উপকরণ হিসেবে পানিভর্তি কলস, গামছা, পিড়ি, দূর্বা, হলুদ, সাবান, তেল ও লুঙ্গি রাখার ব্যবস্থা রাখে। এরপর তারা পর্বানুসারে নিয়মানুযায়ী ধামাইল পরিবেশন করে থাকে। "তবে, সিলেটে ছিয়াশি পর্বের ধামাইল পরিবেশনার প্রচলন রয়েছে বলে জানা যায়।"[৪৯] ধামাইল গান সিলেট অঞ্চলের মেয়েরা চক্রাকারে কাঁধে হাত রেখে কিংবা কোমরে এক হাত রেখে কিংবা দু-হাতে তালি দিয়ে গোলাকার হয়ে ঘুরে ঘুরে নৃত্যাকারে পরিবেশন করে থাকেন।

ধামাইল গানের শিল্পীদের বর্তমান অবস্থা : বর্তমানে ধামাইল গানের পৃষ্ঠপোষকতা খুব একটা নেই বললেই চলে। নিজেদের তাগিদে ঐতিহ্যকে ধরে রাখার জন্য এ পরিবেশনা চর্চিত হয়ে আসছে। বর্তমানে এদেশের ঐতিহ্যবাহী পরিবেশনাগুলো পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে বিলুপ্তির পথে।

২.২.১০. পূর্ববঙ্গ গীতিকা

মধ্যযুগের বাঙলা নাটকের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে পূর্ববঙ্গ গীতিকা নিঃসন্দেহে এক স্বতন্ত্র ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারা হিসেবে বিবেচ্য। মূলত ষোড়শ শতকের দিকে একটি সুনির্দিষ্ট আঙ্গিক হিসেবে গীতিকার আত্মপ্রকাশ ঘটে।

উদ্ভব ও বিকাশ : পূর্ববঙ্গ গীতিকা মূলত মুখে মুখে রচিত। কোন কোন গীতিকা, কিংবদন্তি বা সত্যমূলক ঘটনা গল্প-কিস্‌সার আকারে লোকসমাজে এগুলোর প্রচলন ছিল বলে ধারণা করা হয়। “গবেষকদের ধারণা পূর্ববঙ্গ গীতিকার উদ্ভব পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি। পরবর্তীতে এসকল বাস্তব বা কাল্পনিক ঘটনা গীত-নৃত্যাভিনয়ের মাধ্যমে পরিপূর্ণ নাট্যমূলক পরিবেশনায় রূপান্তরিত হয়।”[৫০]

পরিবেশনের সময় ও স্থান : বছরের যেকোন সময় গীতিকার পরিবেশনা হয়ে থাকে। গীতিকা পরিবেশনের স্থান হিসেবে বাড়ির ভিতরের বাইরের আঙ্গিনা বাজার, খোলা মাঠ, বিশালাকৃতির বটতলা এমনকি নদীর তীর ব্যবহৃত হতো। গীতিকা সাধারণত সারারাতব্যাপী পরিবেশিত হয়ে থাকে।

পোশাকের ব্যবহার : পূর্ববঙ্গ গীতিকা যে নাট্যমূলক তা বোঝা যায় গায়েনের রূপসজ্জারীতি থেকে। সচরাচর গায়েনের নিম্নাংশে পুরুষের পোশাক যেমন লুঙ্গি ও উর্ধ্বাংশে ফতুয়ার উপর শাড়ি বা উড়ুনি জড়ানো থাকে। যেমন-মহুয়ার চরিত্রে উর্ধ্বাংশের শাড়িকে ঘোমটার মতো করে পরিধান করা আবার নদ্যায় চাঁদের পালায় শাড়ি বা উড়ুনিকে কোমরে পেঁচিয়ে গীতিকা পরিবেশনের রীতি দেখা যায়। এছাড়া অলংকার হিসাবে বিশেষ মালার ব্যবহার হয়।

অভিনয় উপকরণ : গীতিকা পরিবেশনের জন্য দুটো বালিশ বা তাকিয়ার ব্যবহার রয়েছে। অনেক পরিবেশনায় কোলবালিশকে ঘোড়া বানিয়ে পরিবেশনা উপস্থাপন করতে দেখা যায়। গামছা, লম্বা, লাল-সবুজের কাপড় পেঁচিয়ে গলায় ঝুলিয়ে রাখতেও দেখা যায়।

বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার : গীতিকা পরিবেশনে হারমোনিয়াম, তবলা, জুরি, করতাল, মন্দিরা, নুপুর বা ঘুঙ্গুর বাঁশি বাদ্যযন্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

সুর ও ছন্দ : স্বরাঘাত-প্রধান গ্রাম্যছন্দে গীতিকার বেশ প্রচলন রয়েছে। পালাকারদের মধ্যে লোক ছন্দের সীমা অতিক্রম করার প্রবণতা নেই বললেই চলে। এছাড়া, “গীতিকার সুর দীর্ঘলয়ের, উজান, ভাটিয়ালী, মুর্শিদি প্রভৃতি গ্রাম্য সুরের ব্যবহার বিদ্যমান।”[৫১]

পরিবেশনরীতি : মুসলমানগণ এই গান গায়, আর শতশত চাষা লাঙ্গলের উপর ভর দিয়ে তা উপভোগ করার বিষয়ে জনশ্রুতি রয়েছে। তবে, গীতিকা পালায় দেখা যায়, চরিত্র অনুযায়ী সংলাপাত্মক গীতসমূহ কখনো বা মূল গায়েন ও দোহারদের মধ্যে ভাগ করে নিতে দেখা যায়। গীতিকার অন্যতম প্রধান পালা হিসেবে বিবেচিত ‘মহুয়া পালা’য় মহুয়ার বয়ঃসন্ধিকালের এক চমৎকার বর্ণনা নিম্নরূপঃ

“ছয়মাসের শিশু কইন্যা পরমা সুন্দরী।
রাত্রি নিশাকালে হুমরা তারে করল চুরী ॥
চুরি নাই কইরা হুমরা ছার‍্যা গেল দ্যাশ।
কইবাম্ সে কইন্যার কথা শুন সবিশেষ ॥
ছয় মাসের শিশুকন্যা বছরের হৈল।
পিঞ্জরে রাখিয়া পঙ্খী পালিতে লাগিল ॥
এক দুই তিন করি শুল বছর যায়।
খেলা কছরত তারে যতনে শিখায় ॥
সাপের মাথায় যেমন থাইক্যা জ্বলে মান।
যে দেখে পাগল হয় বাইদ্যার নন্দিনী ॥
বাইদ্যা বাইদ্যা করে লোকে বাইদ্যা কেমন জনা।
আন্দাইর ঘরে থুইলে কন্যা জ্বলে কাঞ্চা সোনা ॥
হাইট্টা না যাইত কইন্যার পায়ে পড়ে চুল।
মুখেতে ফুট্টা উঠে কনক চম্পার ফুল ॥”[৫২]

২.২.১১. যাত্রা

প্রাচীন ও মধ্যযুগের নানা বিবর্তমূলক স্তর অতিক্রম করে বাংলা নাট্যরীতি বিশেষ আঙ্গিকরূপে যাত্রা বিদ্যমান রয়েছে। একালের আঙ্গিকদৃষ্টে সহস্র বছরের নানা নাট্যরীতিকে একটিমাত্র রূপে বিচার করার প্রবণতার ফলে যাত্রার উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কে সঠিক চিত্র কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। “যাত্রাগানের বিকাশ শুরু হয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে গবেষকদের ধারণা। তাদের মতে, ধর্মীয় উৎসব উপলক্ষে বাঙালির প্রাচীন সংস্কৃতির অন্যতম বাহন যাত্রাগানের উন্মেষ।”[৫৩]

উৎপত্তি ও বিকাশ : যাত্রার উৎপত্তি যেমন বাংলাদেশের থিয়েটার তথা নাটকের আগে, যাত্রার বিকাশও তেমনি থিয়েটারের আগে শুরু হয়েছিল। লোকসংস্কৃতির কতিপয় পাঠ গ্রন্থে যাত্রার উদ্ভব সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পাঁচালি হইতেই যাত্রার উদ্ভব। “যাত্রার সঙ্গে পাঁচালির পার্থক্য হচ্ছে-পাঁচালিতে মূল গায়েন একজন, যাত্রায় একাধিক, সাধারণত তিনজন হয়ে থাকে।”[৫৪]

তবে বিভিন্ন সূত্রে প্রমাণ করা যায় যে, লীলানাট্যরূপে অভিনীত ‘কালিয়দমন’ অবলম্বনে অষ্টাদশ শতকের অন্তে স্বতন্ত্রভাবে যাত্রার প্রকাশ। অষ্টাদশ শতাব্দীতে কৃষ্ণবিষয়ক যাত্রা ‘কালীয়দমন’র সাজসজ্জা ও পরিবেশনারীতি সম্পর্কে প্রদত্ত বিবরণ দৃষ্টে দেখা যায়, এতে দান মান, মাথুর, অক্রূর সংবাদ, উদ্ধব সংবাদ, সুবল সংবাদ প্রভৃতি আখ্যান গৃহীত হয়েছিল। বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে ছিল খোল, করতাল, বেহালা।

সাজসজ্জা : অভিনেতাদের সাজসজ্জার উপকরণ ছিল যৎসামান্য, কৃষ্ণের পীতধরা ও চূড়া এবং যশোমতী, বৃন্দাদি-সখী ও গোপ-বালকগণের পরিধেয় প্রকৃতি একটি রঙিন কাপড়ের ঘেরাটোপ (কতকটা চোগার মতো)। এর সামনের দুই পাশে পেশওয়াজের ন্যায় জরির পাড় বসানো হতো।

যাত্রার সুর : যাত্রার সংলাপের সৃষ্টি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাৎক্ষণিক।“ ঊনিশ শতকে কৃষ্ণকমল গোস্বামী কীর্তনাঙ্গের গানই যাত্রায় পূর্ণাঙ্গরূপে গ্রহণ করেন। রামপ্রসাদী সুর, চণ্ডী প্রভৃতির প্রভাব যাত্রা গানে প্রবেশ করেছিল বলে ধারণা করা হয়।”[৫৫]

বাদ্যযন্ত্র : যাত্রাগানে বাদ্যযন্ত্র হিসেবে খোল, করতাল, মৃদঙ্গ, হারমোনিয়াম, কর্নেট, ক্লারিনেট, ঝাঁঝ প্রভৃতির ব্যবহার বেশ প্রচলিত। তবে সম্প্রতি কীবোর্ড, ড্রাম, কঙ্গো, অক্টোপ্যাডের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

পরিবেশনার সময় : বছরের অন্যান্য সময়ে যাত্রার আয়োজন হলেও মূলত শীতকালই যাত্রার আয়োজনের উপযুক্ত সময়। শীতকালে রাতের বেলা যখন পরিবেশ নীরব ও কুয়াশাচ্ছন্ন হয়ে ওঠে, তখন যাত্রার পালা জনমনে আনন্দমুখর অবয়বের সৃষ্টি করে।

মঞ্চ বা আসর : সাধারণত খোলা মাঠে গোলাকার বা আয়তাকারে টিনের ঘেরা দিয়ে যাত্রার আসর বসে। মূল মঞ্চ ভূমি সমতল থেকে দুই থেকে তিন ফুট উঁচু হয়ে থাকে। কুশীলবদের সাজঘর থেকে মঞ্চে প্রবেশের জন্য বাঁশ দিয়ে বেঁধে তৈরি করা প্রবেশ ও নির্গমনের ব্যবস্থা থাকে। মঞ্চের উপরে টিনের চালা বা ছামিয়ানা থাকে। দর্শকদের বিভিন্নভাবে বসার ব্যবস্থা করা হয়।

আলোর ব্যবস্থা : পূর্বে হ্যাজাক বাতির ব্যবহার থাকলেও বর্তমানে বিদ্যুতের ব্যবহার বহুল প্রচলিত। এমনকি বিকল্প হিসেবে জেনারেটর থাকে।

পরিবেশনারীতি

অষ্টাদশ শতকের যাত্রার সংগীত অপরিহার্য ছিল, সঙ্গে থাকতো দোহার। দোহারের কাজ ছিল, পালার ধুয়া অংশগুলি সমস্বরে গাওয়া এবং পাত্র-পাত্রীর সংলাপের অংশবিশেষও কণ্ঠে মিলানো।

যাত্রাশিল্পের বর্তমান অবস্থা

বাংলাদেশের যাত্রাদলের যথাযথ পরিসংখ্যান নেই। বাংলাদেশ যাত্রাশিল্প উন্নয়ন পরিষদের পক্ষ থেকে এখনো যাত্রাদলের পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রণয়নের তৎপরতা নেই বললেই চলে। “২০০১ সালে প্রায় ৮০টি, ২০০২ সালে ৬৪টি এবং ২০০৩ সালে ৪০টি যাত্রাদল পালা পরিবেশনে সক্রিয় ছিল। তবে স্বাধীনতার পূর্বে এদেশে যাত্রাদলের সংখ্যা ছিল ২২টি। ঐতিহ্যবাহী এ শিল্প বর্তমানে ভয়াবহ সংকটের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হচ্ছে।”[৫৬]

আলোকচিত্র-১৫ : যাত্রা পরিবেশনা (পঞ্চগড়)

আলোকচিত্র-১৬ : যাত্রায় পালা (পঞ্চগড় জেলায় পরিবেশিত)

তথ্যনির্দেশ

১. সেলিম আল দীন, *মধ্যযুগের বাঙলা নাট্য*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১৮, পৃ. ১৭

২. Muhammad Shahidullah, *Buddhist Mystic Songs*, Bengali Academy, Revised and Enlarged Eddition, Dhaka, 1966, p. 53

৩. মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা (সম্পা.), *চর্যাগীতিকা*, ষষ্ঠ সংস্করণ, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা, ১৪১৪ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৫২-৫৩

৪. সাইমন জাকারিয়া, *বাংলাদেশের লোকনাটক: বিষয় ও আঙ্গিক বৈচিত্র্য*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ১৬

৫. জাকারিয়া, ২০০৮, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮

৬. দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২

৭. জাকারিয়া, ২০০৮, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

৮. জাকারিয়া, ২০০৮, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯

৯. তাপস কুমার বন্দোপাধ্যায়, *পাঁচালিকার ও বোলান গানের ইতিবৃত্ত*, প্রতিভাস, কলকাতা, ১৯৬৫, পৃ. ২১

১০. জাকারিয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১-৩৪

১১. দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১

[১২] জাকারিয়া, ২০০৮, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬

[১৩] এম এ মজিদ, *যাত্রার ইতিবৃত্ত*, কারুবাক, ঢাকা, ২০২০, পৃ. ২৩

[১৪] জাকারিয়া, ২০০৮, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬

[১৫] দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৩

[১৬] জাকারিয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২-১৬৮

[১৭] দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৪

[১৮] জাকারিয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৬

[১৯] জাকারিয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৪

[২০] শামসুজ্জামান খান (সম্পা.), *বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা: পঞ্চগড়*, বাংলা একাডেমি, ২০১৩, পৃ. ১৭১-১৭২

[২১] জাকারিয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৮

[২২] জাকারিয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬১

[২৩] ইসরাফিল শাহীন (সম্পা.), *পরিবেশন শিল্পকলা (জারিগান:সাইম রানা)*, খন্ড ১২, এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ৭১।

[২৪] শাহীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬

[২৫] জাকারিয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬২

[২৬] জাকারিয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৬

[২৭] দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৩

[২৮] জাকারিয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৭

[২৯] দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৫

[৩০] দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৩

[৩১] জাকারিয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৬

[৩২] জাকারিয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮০

[৩৩] দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৬

[৩৪] জাকারিয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৬

[৩৫] জাকারিয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৭

[৩৬] জাকারিয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬৪

[৩৭] জাকারিয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬৪-৪৬৫

[৩৮] মাযহারুল ইসলাম তরু, *চাঁপাইনবাবগঞ্জের লোকসংস্কৃতির পরিচিতি*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ৬৬-৬৭

[৩৯] তরু, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪

[৪০] দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৭

[৪১] জাকারিয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫১

[৪২] দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৮

[৪৩] দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৮-৩১৯

[৪৪] জাকারিয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৫

[৪৫] শাহীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২

[৪৬] শাহীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২-১০৩

[৪৭] সুমনকুমার দাস, *বাংলাদেশের ধামাইল গান*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ৯

[৪৮] দাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬

[৪৯] শাহীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২-১০৪

[৫০] দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৩

[৫১] দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৩-২৯৪

[৫২] দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯০-২৯৫

[৫৩] তপন বাগচী, *বাংলাদেশের যাত্রাগান: জনমাধ্যম ও সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ১১- ১২

[৫৪] তপন বাগচী, *লোকসংস্কৃতির কতিপয় পাঠ*, গতিধারা, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ১২

[৫৫] দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৯-৩১৪

[৫৬] বাগচী, ২০০৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ২১

তৃতীয় অধ্যায়

পঞ্চগড় জেলার হুলি গানের পরিবেশনাশৈলী

৩.১. পঞ্চগড় জেলার হুলি গান

বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতির ভাণ্ডার অনেক বেশি সমৃদ্ধ একথা অনস্বীকার্য। লোকসংস্কৃতির নানা উপাদানে পরিপূর্ণ এদেশ চিরযৌবনা। সংস্কৃতির নানান ঐতিহ্যবাহী ধারা সুপ্রাচীনকাল থেকেই এদেশের মানুষ লালনপালন করে আসছে। অন্যান্য জাতির মধ্যে জীবন-জিজ্ঞাসা যেমন দর্শন শাস্ত্রের চিরায়ত রূপ লাভ করে, এদেশের মানুষের মধ্যে তা অতি সহজেই গীতিময় পরিবেশনারীতিতে রূপ লাভ করে। তার দৃষ্টান্ত এদেশের ধর্মীয় গীতি ও ধর্মীয় আখ্যান নির্ভর নাট্যরীতির পরিবেশনায় সহজেই উপলব্ধি করা যায়।

বাংলাদেশের সর্ব উত্তরের জেলা পঞ্চগড় লোকসংস্কৃতির নানা সমৃদ্ধ উপাদান দ্বারা পরিপূর্ণ। এ অঞ্চলের লোকজ উপাদানের মধ্যে সর্বাধিক পরিচিত ও জনপ্রিয় পরিবেশনা হচ্ছে-'হুলির গান'। 'হুলি' একই সাথে একটি লোকসংগীত এবং লোকনাট্য হিসেবে এ অঞ্চলে বেশ সমাদৃত। কাজেই, এটিকে মিশ্ররীতির পরিবেশনারীতি বলা যেতে পারে। এটি এলাকাভেদে ধামের গান, হুলির ধাম, পালাটিয়া, ঢাকের গান, মাড়াঘুরা এসব নামেও প্রচলিত। নীতিকথা সম্বলিত উপাখ্যান বা সমাজ চিত্রকে কুশীলবগণ মঞ্চের চারপাশে চক্রাকারে বসে থাকা দর্শকগণের সামনে ঘুরে ঘুরে অভিনয় ও গীত সহযোগে উপস্থাপন করে থাকেন। "গান, কাহিনী, সংলাপ, অভিয়ের পাশাপাশি নৃত্যের সংযোজনের মধ্যদিয়ে এক দ্বন্দ্ব-সংঘাতময় জটিল আবহে হুলি গানের পরিবেশনা বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারায় লোকনাট্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসেবে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছে।"[১] বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারায় হুলি একটি জনপ্রিয় লোকনাট্য হিসেবে বিবেচ্য।

বাংলাদেশে ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারার মাধ্যমে সাধারণ জনগোষ্ঠীর ভাব-জগতের এক অভিন্ন সত্তার পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে, আর তা অন্য কোন মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা অসম্ভব। "এদেশের ভাব-সাধনার ক্রম-বিবর্তনের ধারা অনুসরণের পাশপাশি এ সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে হলে এদেশের ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারা অনুশীলনের কোন বিকল্প নেই।"[২]

এদেশের নাট্যশিল্পের আবির্ভাব ও বিস্তার সম্পর্কে একটি ধারণা হচ্ছে, আধুনিক যুগের প্রারম্ভে ব্রিটিশ শাসনামলে এ শিল্পমাধ্যমের ব্যাপকভাবে আত্মপ্রকাশ ঘটে। তবে, বাঙলা সাহিত্যের ধারায় নাটকের সূচনা হিসেবে ঊনিশ শতকে

বলে অনমান করা হয়। এদেশের নাটকের সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস জানতে আমাদের প্রাচীন এবং মধ্যযুগের সাহিত্যধারার বিশ্লেষণ ও অনুসন্ধান একান্ত আবশ্যক। "ঐতিহ্যবাহী এই শিল্পমাধ্যম আমাদের বাঙলা জনপদে সহস্র বছর ধরে বহমান বলে ধারণা করা অপ্রাসঙ্গিক নয়। বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী নাট্য বিশ্লেষণপূর্বক দেখা যায় যে, এর প্রায় বেশিরভাগ কাব্যই পরিবেশনমূলক উপস্থাপনা।"[৩]

পাঁচালি বা গেয়কাব্য নাট্যমূলক পরিবেশনা এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। "পাঁচালির একটি সুবিস্তৃত ধারা মৌখিক রীতিতে রচিত হয়েছিল বলে গবেষকদের ধারণা। আর এসকল মৌখিক রীতির পরিবেশনা মূলত আসরকে কেন্দ্র করেই হয়ে থাকে। আখ্যান সম্পূর্ণত আসরকেন্দ্রিক।"[৪]

তবে, প্রাচীন বাংলার বুদ্ধ নাটক নৃত্য ও গীতের সমন্বয়ে পরিবেশিত হতো। পঞ্চগড় জেলার লোকনাট্য হুলি গানের পরিবেশনাতেও নৃত্য ও গীতের সম্মিলিত প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। পূর্ণিমার তিথিতে হোলি উৎসবকে কেন্দ্র করে মিশ্ররীতির পরিবেশনা হুলির গানের আয়োজন হয়ে থাকে। পূর্বে দেবস্তুতিমূলক বিষয়বস্তু হুলির পরিবেশনায় অন্তর্ভুক্ত থাকলেও বর্তমান বিষয়বস্তু হিসেবে সামাজিক প্রেক্ষাপট অন্তর্ভুক্ত হতে শুরু করেছে। ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারার অনুশীলনের মাধ্যমেই এদেশের আত্মমর্যাদাবোধের পুনর্জাগরণ ঘটানো সম্ভব। কেননা, এর ভিতর দিয়ে বহুকাল থেকে এদেশের মানুষের আত্মিক মেলবন্ধন স্থাপিত হয়ে আজো তা বহমান। এদিক বিবেচনায়, ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারায় পঞ্চগড় জেলার জনপ্রিয় লোকনাট্য হুলি গান বা ধামের গানের যে বিশেষ আবেদন রয়েছে, তার সাথে এ অঞ্চলের সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার যে রূপ ফুটে ওঠে, তা অন্য কোন পরিবেশনায় পাওয়া সম্ভব না। হুলি গানের মধ্যে এ অঞ্চলের মাটি ও মানুষের সুঘ্রাণ মিলে।

৩.২. আঙ্গিক পরিচয় ও বিষয়-বৈচিত্র্য

বর্তমানে প্রচলিত এদেশের ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারা প্রত্যক্ষ করলে বিষয়-বৈচিত্র্যের চেয়ে আঙ্গিক বৈচিত্র্য বেশি চোখে পড়ে। শুধু তাই নয়, কেউ যদি নিরন্তর এখানকার ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারা পর্যবেক্ষণ করেন তাহলে একটি সাধারণ চিত্র দেখতে পারেন, আর তা হচ্ছে- এক একটি বিষয়বস্তুকেন্দ্রিক নাট্যধারার নানা ধরণের পরিবেশনারীতি ছাড়া অঞ্চলভেদে একই বিষয়বস্তুর পরিবেশনারীতি বা উপস্থাপনা আঙ্গিক প্রচলিত। এছাড়া অঞ্চলভেদে একই বিষয়বস্তুর পরিবেশনারীতি এদেশে যেমন ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে তেমনি একই অঞ্চলে একই বিষয়বস্তুর নানা ধরণের পরিবেশনারীতি প্রচলিত রয়েছে। সর্পদেবী মনসা বা পদ্মাদেবীর মাহাত্ম্য প্রকাশক আখ্যানটির বহু ধরণের

পরিবেশনা এদেশে প্রচলন লক্ষ্যণীয়। যেমন- পঞ্চগড় জেলায় যার পরিবেশনা ‘কান্দনী বিষহরির গান’ নামে, আবার কোথাও এটি ‘মনসামঙ্গল’, কোথাও ‘পদ্মাপুরাণ গান’, কোথাও ‘বিষহরির গান’, ‘রয়ানি’, কিংবা ‘বেহুলা-লক্ষ্মীন্দরের গান’, ‘মা মনসা’ ইত্যাদি নামে পরিবেশিত হয়ে থাকে। এ বিবেচনায় পঞ্চগড় জেলার হুলি গানের ক্ষেত্রেও একই বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। হুলি শব্দটির উৎপত্তি হোলি থেকে। দোলপূজা উপলক্ষ্যে উত্তর ভারতের অনুকরণে একটি জনপ্রিয় লোকনাট্য হিসেবে প্রচলিত। ‘হোলি’ পূজার ধর্মীয় অনুষঙ্গ অতীতে প্রচলিত থাকলেও বর্তমানে সমাজের নানা রঙ্গরসিকতামূলক কাহিনী, সামাজিক ও পারিবারিক ঘটনা, প্রণয়চিত্র, সমসাময়িক প্রসঙ্গে এমনকি নাগরিক সমাজের ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ, বিচার-আচার ইত্যাদি বিষয়বস্তু হিসেবে পরিবেশিত হয়। আবার এই একই ধরণের পরিবেশনা পঞ্চগড়ের সীমান্তবর্তী ভারতের জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি জেলার পূর্বে ‘ঢাকের গান’ ও ‘মাড়াঘুরা’ গান এবং বৃহত্তর দিনাজপুর জেলার ‘পালাটিয়া’, ‘ধাম’, ‘নাড়াঘুরা’ ইত্যাদি নামেও পরিবেশিত হয়ে থাকে। অর্থাৎ, অঞ্চলভেদে একই বিষয়বস্তুর পরিবেশনারীতির স্বতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য যেমন এদেশে দেখা যায়, তেমনি পরিবেশনারীতির নামগুলোও স্বতন্ত্র হয়ে থাকে। “ !কোন কোন ক্ষেত্রে নাম একই হলেও অঞ্চলভেদে তার পরিবেশনা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হয়ে থাকে। প্রাচীন বাংলার বুদ্ধনাটকের বিষয়বস্তু গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনযাপনের কাহিনীকে উপজীব্য করে উপস্থাপন করা হতো।”[৫]

৩.৩. হুলি গানের নামকরণ

পঞ্চগড় জেলার ঐতিহ্যবাহী পরিবেশনার নাম হুলি গান। আর এই ‘হুলি’ গানকে এ অঞ্চলে ‘হোলির ধাম’, ‘হুলির ধাম’, ‘ধামের গান’, ‘পালাটিয়া’ নামেও অভিহিত করা হয়। বিশেষজ্ঞদের মতে শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উপলক্ষে দোল পূর্ণিমায় হোলিখেলার পাশাপাশি লোকজ পরিবেশনা হিসেবে হোলির বা হুলির গানের উদ্ভব। জলপাইগুড়ি জেলার রাজবংশীদের মাঝে সরস্বতী পূজা উপলক্ষে পালাটিয়া নামে যে পরিবেশনা রয়েছে তার সাথে হুলির পরিবেশনায় বেশ সাদৃশ্য রয়েছে ধারণা করা হয়।

হোলি উৎসবকে কেন্দ্র করেই হুলির গানের প্রচলন। আর এই ‘হোলি’ শব্দের উৎপত্তি ‘হোলা’ শব্দ থেকে বলে গবেষকদের ধারণা। এই ‘হোলা’ শব্দের অর্থ হল আগাম ফসলের প্রত্যাশায় ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা। আবার অনেকের মনে করেন, ‘হোলি’ শব্দটি সংস্কৃত শব্দ ‘হোলকা’ হতে উদ্ভূত এবং যার অর্থ অর্ধপক্ব শস্য মনে করা হয়। ভারতের পাঞ্জাব, হরিয়ানা প্রদেশসহ বেশ কয়েকটি অঞ্চলে আধ-পাকা গম ও ছোলা খাওয়ার রীতি প্রচলিত। তবে,

পৌরাণিক গল্প রয়েছে, যেখানে হিরণ্যক শিপু তার পুত্রসন্তান প্রহল্লাদকে হত্যার জন্য বোন হোলিকাকে নিযুক্ত করেছিল। হোলিকার এক বিশেষ মন্ত্রপূত শাল ছিল যা তাকে সবসময় আগুন থেকে রক্ষা করত। অথচ হোলিকা তার দাদা হিরণ্যকশিপুর কথামত ভ্রাতুষ্পুত্র প্রহল্লাদকে হত্যার উদ্দেশ্যে আগুনের মাঝে বসায় নিজে ভষ্মীভূত হয়ে গেলেও বিষ্ণুপূজারী প্রহ্লাদ অক্ষত অবস্থায় বেঁচে যায়। হোলিকা আগুনে দহনের পর নৃসিংহরূপ ধারণ করে ভগবান বিষ্ণু হিরণ্যকশিপুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং তাকে দুই টুকরা করে ফেলে। আর এ ঘটনাকে কেন্দ্র করেই হোলি উৎসব শুরু হয় বলে ধারণা করা হয়। দোলের আগের দিন কাঠ, বাঁশ ও খড় দিয়ে বিশেষ অগ্নিকা ব্যবস্থা করা হয় যা চাঁচর বা নেড়াপোড়া নামে পরিচিত। এছাড়া অতি আশ্চর্য হলেও সত্য যে পার্শ্ববর্তী বন্ধুরাষ্ট্র ভারতের মূলতানে যে সূর্যমন্দির রয়েছে তা এই ঘটনার দৃষ্টান্ত হিসেবে স্বীকৃত। আবার দোলপূর্ণিমার উৎপত্তি সম্পর্কে বাঙ্গালি বা বৈষ্ণব মতেও যে ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, তাতে সাধারণত ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমা তিথিতে রাত্রি বেলায় দোল উৎসবের কথা বলা হয়েছে। রাধাকৃষ্ণের চরণে ভক্তিভরে আবির দেওয়ার মাধ্যমে উৎসব শুরু হয় এবং সেইসাথে ভজন-কীর্তনও পরিবেশিত হয়। পরে সেই আবির সবাইকে মাখিয়ে রাঙানো হয়ে থাকে। পঞ্চগড় জেলার 'হুলি' গান পরিবেশনের আগের দিন এমন রঙ মাখানোর রীতি প্রচলিত রয়েছে। দোলপূর্ণিমাকে কেন্দ্র করে হোলি উৎসবকেন্দ্রিক আখ্যানধর্মী ঐতিহ্যবাহী লোকনাট্য হিসেবে 'হুলি গান' পরিবেশিত হয়ে থাকে।

৩.৪. হুলি গানের উদ্ভব ও বিকাশ

হুলি গানের উদ্ভব ও উৎপত্তির সঠিক ইতিহাস জানা যায় না। প্রবীণ কুশীলব (অভিনয়ের পাত্র-পাত্রী) ও নাট্যকার এবং প্রবীণ দর্শকের মতে, হুলি গান হুলি উৎসব বা দোলপূর্ণিমাকে কেন্দ্র করে বহুকাল আগে হতে প্রচলিত হয়ে আসছে। কারো কারো মতে, হুলি গানের বয়স আনুমানিক ৪০০-৫০০ বছর। ধর্মীয় বিষয়ক উৎসবকে কেন্দ্র করে হুলি গানের উদ্ভব ঘটলেও এর পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটেছে মূলত সমসাময়িক প্রেক্ষাপটকে আশ্রয় করে উপস্থাপিত পরিবেশনার মধ্য দিয়ে। ধীরে ধীরে সমাজের নানা অসঙ্গতি উঠে এসেছে হুলি গানের আঞ্চলিক ভাষার সহজ-সরল ও প্রাণবন্ত পরিবেশনার মধ্য দিয়ে। শুধুমাত্র হিন্দু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মানুষদের পালনীয় বস্তু হয়েও হুলি গান হয়ে ওঠে সর্বজনীন। এ অঞ্চলের একটি জনপ্রিয় ঐতিহ্যবাহী লোকনাট্য তথা পরিবেশনা হিসেবে এর দ্রুত বিকাশ ঘটে। গ্রামীণ মানুষের প্রতিচ্ছবি ফুটিয়ে তোলার মধ্য দিয়ে এর প্রসার ঘটতে থাকে। পঞ্চগড় জেলার হুলি গানকে পার্শ্ববর্তী জেলায় মাড়াঘুরা, নাড়াঘুরা, পালাটিয়া নামে উল্লেখ করা হয়। প্রতিবছর দোল উৎসবকে কেন্দ্র করে হুলি গান পরিবেশিত হলেও অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠানেও হুলির আখ্যানধর্মী পরিবেশনা হয়ে থাকে। এ ধারা উদ্ভব কবে তা বলা

দুরূহ। কেননা, হোলি উৎসব পালনের রীতি বহু প্রাচীন। তবে, বাংলাদেশে হুলি গানের প্রচলন খুব বেশি পুরনো নয়। 'হুলি' গান প্রথমদিকে দেবস্তুতিমূলক ছিল। পরবর্তীতে সমাজের নানা বিষয় এর উপজীব্য হয়ে উঠে।

নানা অসঙ্গতি তুলে ধরা হয় আখ্যানধর্মী লোকনাট্য হুলির পরিবেশনের মাধ্যমে। গীত, সংলাপ, অভিনয় ও নৃত্যের এক অপূর্ব সম্মিলনের মধ্য দিয়ে হুলি গানের বিকাশ। পঞ্চগড় জেলার হিন্দু সম্প্রদায়ের বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসব পালনের সাথে হুলি গানের পরিবেশনা ব্যাপকভাবে জড়িত। স্থায়ী ধামে ষাট-সত্তর বছর ধরে হুলি গান পরিবেশিত হয়ে আসছে বলে পঞ্চগড় জেলার প্রবীণ হুলি গানের শিল্পীদের মতামত।

৩.৫. হুলি গানের পৃষ্ঠপোষক ও বায়না

হুলি গানের প্রধান পৃষ্ঠপোষক অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে থাকা সনাতনে ধর্মবিশ্বাসী গ্রামের সাধারণ মানুষ। প্রতিবছর দোলপূর্ণিমা লক্ষ্মীপূজা, সরস্বতী পূজা ও দূর্গাপূজা উপলক্ষে গ্রামের সনাতন ধর্মবলম্বী সাধারণ মানুষ বাড়ি বাড়ি চাল, ধান এবং যার যার সামর্থ্য অনুযায়ী টাকা প্রদান করে আয়োজক কমিটির মাধ্যমে প্রদত্ত টাকা 'হুলি' গানের দলের বায়নামা ও অনুষ্ঠান পরিচালনা করে থাকেন। তিন/চার দশক পূর্বে হুলি গানের পরিবেশনার জন্য একাধিক দল একই আসরে উপস্থিত থাকতো। পরিবেশনার জন্য নির্ধারিত ধামে একেকটি দল তাদের পরিবেশনা শুরু করলে দর্শকদের মতামতের উপর ভিত্তি করে দলের পরিবেশনার সময়সীমা নির্ধারিত হতো। যে দলের পরিবেশনা দর্শকদের ভালো লাগতো না সে দলকে ধাম পরিত্যাগের জন্য ঘণ্টা বাজিয়ে সতর্ক সংকেত প্রদান করা হতো। এভাবে সারারাতব্যাপী কয়েকটি দলের পরিবেশনা হতো, এমনকি হুলির পরিবেশনের জন্য ঐসময় বায়নামা বা সম্মানি ছিল না। কেবল হুলি গানের শিল্পীদের পরিবেশনার শুরু এবং শেষে খাবারের ব্যবস্থা থাকতো।

বর্তমানে হুলি গান পরিবেশনের জন্য একটি দলকে একরাত্রের পরিবেশনার জন্য সর্বোচ্চ ১৫ থেকে ২০ হাজার টাকা বায়নামা করা হয়। দূরত্ব অনুযায়ী বায়না কম বা বেশি হয়ে থাকে। বায়নার সকল অর্থ এলাকাবাসী নিজেরা চাঁদা তুলে সেই অর্থ প্রদান করে থাকে। পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে দলের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে অনেক কম হবার কারণে একই দিনে একাধিক ধামে বায়নার জন্য তদবির পেয়ে থাকে।

৩.৬. হুলি গান পরিবেশনার সময়

পঞ্চগড় জেলার দেবীগঞ্জ, বোদা, আটোয়ারী ও পঞ্চগড় সদরের বেশ কয়েকটি স্থানে দোলপূর্ণিমার সময় হুলি গানের আয়োজন করা হয়ে থাকে। এছাড়াও হিন্দুদের বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান; যেমন- দূর্গাপূজা, লক্ষ্মীপূজা, কালীপূজা, সরস্বতী পূজা এবং বিভিন্ন উৎসবের সময় হুলির গান পরিবেশিত হয়ে থাকে। তবে, হুলি গানের প্রবীণ শিল্পী বাসুদেব রায়ের মতে, আশ্বিন কার্তিক মাস বিশেষ করে দোল পূর্ণিমা উপলক্ষে হুলির গানের আয়োজন করা হয়। পূর্ণিমার দিন ঠাকুরের বিয়ে দেওয়া হয়। পরেরদিন ঠাকুরকে নিয়ে বাড়ি বাড়ি ঘুরে চাল-ডাল, মরিচ, আদা এসব সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। হারমোনিয়াম, খোল, মন্দিরা, জুড়ি, আড় বাঁশি এসব বাদ্যযন্ত্র সহযোগে ঘুরে ঘুরে পুরো গ্রামে মনশিক্ষা গান পরিবেশন করা হয় যাকে শোয়ারি বলে। পরের দিন স্থায়ী বা অস্থায়ী ধামে হুলির গান পরিবেশিত হয়।[৬] হুলির গান পরিবেশনের পূর্বে মূল মঞ্চ বা ধামে আঞ্চলিক গানের আয়োজন করা হয়ে থাকে। বিকাল হতে রাত ৮টা এমনকি ১০টা পর্যন্ত গানের আয়োজন চলে। ১০টার দিকে হুলি দল তাদের পরিবেশনা শুরু করে পরদিন সকাল ৯টা-১০টা পর্যন্ত পরিবেশনা চালিয়ে যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে দুই থেকে তিন দিনব্যাপী হুলির পরিবেশনা চলে। সেক্ষেত্রে একাধিক দলের ব্যবস্থা থাকে। কিছু ক্ষেত্রে একটি দলের একাধিক পরিবেশনাও হয়।

৩.৭. হুলি গানের মঞ্চ বা আসর বা ধাম

পঞ্চগড় জেলার ঐতিহ্যবাহী হুলি গানের পরিবেশনার জন্য বর্তমানে কিছু স্থায়ী মঞ্চ বা ধাম তৈরি করা হয়েছে। এসকল ধাম বা আসর বাজারের পাশে ফাঁকা মাঠ, মন্দিরের মাঠের প্রাঙ্গণ কিংবা কারো বাড়ির বাইরের আঙ্গিনায় স্থায়ীভাবে তৈরি করা। কিছু মঞ্চ বা আসর অস্থায়ীভাবে তৈরি করা হয়ে থাকে। হুলি গানের জন্য ১০থেকে ১৫ ফুট বর্গাকারে দেড় থেকে দুই ফুট উঁচু ধাম মঞ্চ হিসেবে ব্যবহৃত হয়, ধাম বা মঞ্চের মেঝের মাটি ভালো করে পানি দিয়ে কাদামাটি লেপে দেয়া থাকে। ধামের চার কোণে ৪টি বাঁশের খুঁটি বসানো থাকে। যদিও পূর্বে খুঁটির পরিবর্তে কলা গাছ কেটে তা ৪ কোণে ৪টি গর্ত করে পুঁতে দেওয়ার রীতি বেশ প্রচলিত ছিল।

বর্তমানে ‘হুলি’ গানের মূল মঞ্চের বা ধামের উপরাংশ ছামিয়ানা দ্বারা আবৃত থাকে। মূল মঞ্চের চতুর্দিকে ফাঁকা অংশ রশি দিয়ে টানা থাকা। একপাশে মঞ্চে প্রবেশ করার মতো তিন থেকে চার ফুট প্রসারিত দরজা রাখা হয়। সেই দরজা বরাবর মূল মঞ্চের অদূরে সাজঘরে যাবার ব্যবস্থা থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে প্রবেশ ও বাহির হবার জন্য আলাদা ব্যবস্থা থাকে। মঞ্চের চারদিকে থাকে দর্শকের অবস্থান। তবে কিছু ক্ষেত্রে দর্শক চারপাশে অবস্থান করলেও

মহিলাদের জন্য যে কোন একপাশে আলাদা ব্যবস্থা করা হয়। দর্শকদের বসার জন্য চট বা কার্পেট ব্যবহার করা হলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে খড় বিছিয়ে দেয়ার রীতি প্রচলিত। পূর্বে মূল মঞ্চের উপরে পুরাতন শাড়ির কাপড় বা বিছানার ছাদরের ছাউনি কিংবা বড়জোর টিনের ছাউনী দেওয়া হতো। তবে যেসকল স্থায়ী ধাম বা মঞ্চ রয়েছে তাতে হুলি গান পরিবেশনের জন্য মূল মঞ্চের পাশাপাশি পুরা মাঠকে ছামিয়ানা দ্বারা সজ্জিত করা হয়ে থাকে। মঞ্চের সাজসজ্জা পৃষ্ঠপোষকদের উপর অনেকাংশেই নির্ভর করে। কেননা, সাধারণ কৃষক শ্রেণীর নিকট ঝাঁকঝমকপূর্ণ মঞ্চের জন্য যে মোটা অংকের অর্থ দরকার তা অসম্ভব।

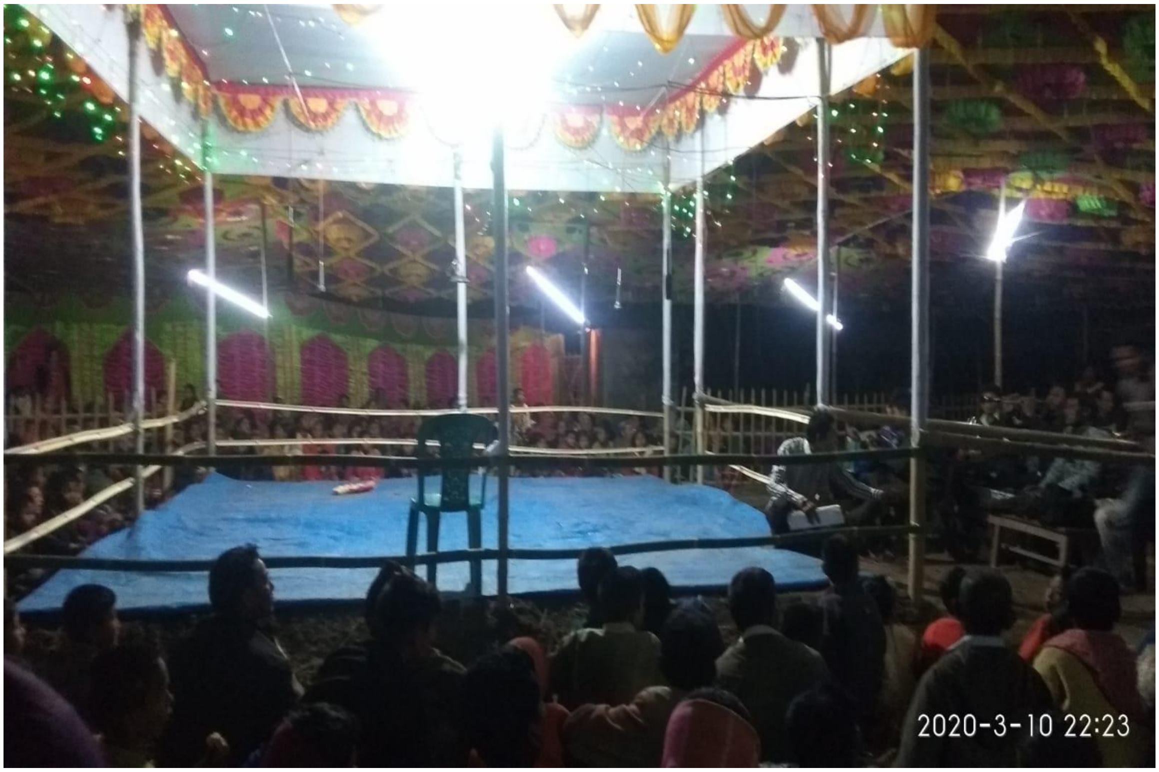

আলোকচিত্র-১৭ : হুলি গানের মঞ্চ বা আসর (মির্জাপুর, আটোয়ারী,পঞ্চগড়)

৩.৮. হুলি গানে আলোকসজ্জা

হুলি গান সাধারণত রাতে শুরু হয়ে পরদিন সকাল পর্যন্ত পরিবেশিত হয়। কাজেই রাতের জন্য আলোর ব্যবস্থা হিসেবে বিদ্যুতের ব্যবহার চোখে পড়ার মতো। বৈদ্যুতিক বাতি দ্বারা মূল মঞ্চ ছাড়াও দর্শকের অবস্থানেও আলোর ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। বর্তমানে দেশের সর্বত্র বিদ্যুতের আওতাধীন হয়ে পড়ায় এর যথাযথ ব্যবহারের ফলে

গ্রামীণ এসব ঐতিহ্যবাহী পরিবেশনা অনেকটা সহজ হয়েছে। পূর্বে হুলির গানের মঞ্চে আলোর ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হ্যারিকেন বা হ্যাজাক বাতির ব্যবস্থা থাকতো। তারও পূর্বে খড়ের মাধ্যমে ডেরা পাকিয়ে বা ভূতি বানিয়ে তাতে আগুন জ্বালিয়ে আলোর ব্যবস্থা করা হতো বলে হুলির প্রবীণ দর্শকদের নিকট শোনা যায়।

এছাড়াও বিদ্যুতের বিকল্প হিসেবে জেনারেটর রাখার রীতি বর্তমানে ব্যাপকভাবে প্রচলিত। হুলি গানের ককেজন কুশিলব মনে করেন, বিদ্যুতের ব্যবহার পরিবেশার ক্ষেত্রে বড় ধরণের উপকাওে আসলেও তা অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে হুলি গানের স্বকীয়তা ও ভাব-গাম্ভীর্য ক্ষুণ্ন হচ্ছে।

৩.৯. সাজঘর

হুলি গানের পরিবেশনায় সাজঘর বলে কিছু থাকে না। তবে বর্তমান পরিবেশনাগুলোয় মূল মঞ্চের অদূরে একটি সাজঘরের ব্যবস্থা করা হয়। মূল মঞ্চ হতে তিন বা চার ফুট প্রশস্ত রাস্তা প্রবেশ-নির্গমন পথ হিসেবে ব্যবহারের ব্যবস্থা থাকে। এর ফলে হুলি গানের শিল্পীগণ সহজেই মঞ্চে অভিনয় শেষে সাজঘরে প্রবেশ করতে পারে। সাজসজ্জার জন্য নারিকেল তৈল, সরিষার তৈল, কাজল, আলতা, লিপস্টিক, চিরুনি, দুল, বিভিন্ন রঙের পুঁতির মালা, জিঙ্ক অক্সাইড পাউডার, সিঁদুর, ক্রেপ, পাটের আঁশ, পাটখড়ি টুকরো কিছু কাপড় রাখা হয়।

তাছাড়া,হুলি গানের বিষয়বস্তুর উপর নির্ভর করে চরিত্র অনুযায়ী রূপসজ্জার ব্যবস্থা করা হয়। যেমন ‘বেগুন পহড়া’ পালায় চরিত্র অনুযায়ী বৌমা চরিত্রে শাড়ি, ব্লাউজ, পেডিকোট ব্যবহার, শশুড় চরিত্রে পাঞ্জাবি, লুঙ্গি পরিধান করে পাটের আঁশ দিয়ে দাড়ি-গোঁফ তৈরি। শাশুড়ি চরিত্রে মাথার চুল চুন দিয়ে সাদা করে দেয়া এবং মুখে পান খাওয়া ঠোঁট প্রদর্শনের জন্য দুই ঠোঁটের দুই পাশে গাঢ় লাল লিপস্টিক দিয়ে একটু রঙ করে দেওয়ার প্রচলন রয়েছে। হুলির গানের শিল্পীদের জন্য বর্তমানে সাজসজ্জার ব্যবস্থা থাকলেও পূর্বের রীতি এমনটি নয়।

৩.১০. হুলি গানে পোশাকের ব্যবহার

হুলি গান পরিবেশনে চরিত্র অনুযায়ী পুরুষেরা চেক লুঙ্গি, সাদা পাঞ্জাবি, ধুতি, পায়জামা, স্যান্ডো গেঞ্জি, স্যুট-কোট, শার্ট-প্যান্ট, চাদর ব্যবহার করে থাকেন। পুরুষেরাই মূলত নারী চরিত্রে অভিনয় করে থাকেন বলে সেসব চরিত্র

ফুটিয়ে তুলতে উজ্জ্বল রঙ্গের শাড়ি, বয়স্কদের শাড়ি, ব্লাউজ, মেক্সি, মাথার বেল্ড, ওরনা, থ্রি-পিছ, লেহেঙ্গা ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এছাড়া পুলিশ-দারোগা চরিত্রে পুলিশের পোশাক, গ্রাম্য চৌকিদার চরিত্রে চৌকিদারের পোশাক, ঠাকুর চরিত্রে ধুতি ও সাদা গেঞ্জি বা পাঞ্জাবির ব্যবহার, ছুকরী চরিত্রে উপরে গেঞ্জি, টপস, ব্লাউজ এবং নিচে স্কার্ট ব্যবহারের প্রচলন রয়েছে। প্রবীণ অভিনেতাদের ভাষ্যমতে, পূর্বে পোশাকের ক্ষেত্রে চরিত্র যাই হোক নিত্য ব্যবহার্য পোশাকেই তারা হুলির গান পরিবেশন করতেন। তবে, বর্তমান কালে পোশাকের মধ্যে অনেকটা আধুনিকতা এসেছে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে সবুজ, হলুদ রঙের ফতুয়া পড়ার রীতিও প্রচলিত।

৩.১১. হুলি গানের অভিনয় উপকরণ

পঞ্চগড় জেলার লোকনাট্য হুলি গানের পরিবেশনার উপকরণ নির্ভর করে বিষয়বস্তুর উপর। অনেক ক্ষেত্রে জমিদারি জুতা, টুপি, লাঠি, গামছা, ঝাড়ু, পুলিশের পোশাক, চৌকিদারের খাকি পোশাক, বন্দুক, চেয়ার, ছোট টেবিল, মগ, বালতি, বিভিন্ন কৃষি সরঞ্জামাদির মধ্যে কাঁচি, দা, কুড়াল, বসিলা, বটি, কাত্তি, মাথার টোপর বা মাথাল, ছাতা প্রভৃতি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। হুলি গানের পরিবেশনে অভিনয় উপকরণ নির্দিষ্ট করা থাকে না। যেদিন যে বিষয়বস্তুর উপর হুলির পালা পরিবেশিত হয়ে থাকে সে অনুযায়ী চরিত্র তৈরিতে সঙ্গতিপূর্ণ অভিনয় উপকরণ ব্যবহার করা হয়। পাটকাঠি দিয়ে দাঁত তৈরি, রান্নার পাতিলের কালি দিয়ে মুখ কালো করা, পাটের আঁশ দিয়ে দাড়ি, গোঁফ, কাজল দিয়ে নষ্ট দাঁত প্রদর্শন করতে মাঝখানে কালি করে দেয়ার উপকরণগুলো প্রায়ই ব্যবহার করতে দেখা যায়। বর্তমানে অভিনয় উপকরণের অনেক কিছুই রেডিম্যাট বা সহজেই পাওয়া গেলেও পূর্বে অভিনয় উপকরণের বেশিরভাগই শিল্পী বা অভিনেতাগণ নিজেরাই ব্যবস্থা করতেন।

2019-3-24 08:30

আলোকচিত্র-১৮ : হুলি গানের অভিনয় উপকরণ

৩.১২. হুলি গানে বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার

পঞ্চগড় জেলার ঐতিহ্যবাহী লোকনাট্য হুলি গানের পরিবেশনায় সাধারণত লোকজ বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা হয়ে থাকে। হুলি গানের কুশিলবদের মতে, হুলির গান পরিবেশনায় মূলত হারমোনিয়াম, খোল, মন্দিরা ও করতাল ব্যবহৃত হতো। তবে, বর্তমানে হারমোনিয়াম, খোল, মন্দিরা, করতাল ব্যবহারের পাশাপাশি তবলা, জুরি, ঘুঙুর, আড় বাঁশি ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার হুলি গানের পরিবেশনায় বেশি লক্ষ্য করা যায়। এছাড়াও অনেক ক্ষেত্রে ক্যাসিও, কর্নেট, ক্লারিনেট ইত্যাদি আধুনিক বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

৩.১৩. সুর ও তালের ব্যবহার

পঞ্চগড় জেলার হুলি গানের পরিবেশনায় সুরের বৈচিত্র্য রয়েছে। ভাওয়াইয়া গানের সুর, কীর্তনের সুর, পুঁথির ঢং এমনকি রাজবংশীদের ভাওয়াইয়ার সুর হুলির পরিবেশনায় ব্যবহার হয়ে থাকে। টানা সুর, তবে ভেঙ্গে ভেঙ্গে গান পরিবেশন হুলিকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের রূপ দেয়। সাধারণত, কাহারবা, দাদরা ও ঝুমুর তালে হুলি গান পরিবেশিত হলেও একই গানে কাহারবা, দ্রুত দাদরা ও ঝুমুরের ব্যবহার হুলি গানকে ব্যতিক্রমধর্মী পরিবেশনা রীতিতে পরিণত করেছে। হুলি গানের প্রবীণ কুশিলব ও দর্শকদের মতে, এই জনপ্রিয় পরিবেশনার সুরে আগের তুলনায় আবেদন

কমে গেছে। নারী চরিত্রে পুরুষদের অভিনয় করার কারণে নারী কণ্ঠ আর এখন খুব বেশি সুমধুর আবেদন সৃষ্টি করতে অনেক ক্ষেত্রেই দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে। তবে, আঞ্চলিক সুরের প্রভাব এখনো মুছে যায়নি একথা অকপটে স্বীকার করা যায়।

৩.১৪. হুলি গানের ভাষা

পঞ্চগড় জেলার হুলি গানের কোন লিখিত রূপ নেই। এ গানের পরিবেশনায় গীত ও সংলাপে পঞ্চগড়ের আঞ্চলিক উপভাষার অর্থাৎ কথ্য ভাষার ব্যবহার হুলিকে প্রদান করেছে স্বকীয়তা। কথ্যভাষা বা আঞ্চলিক উপভাষায় রচিত বিভিন্ন পালা পরিবেশিত হলেও এগুলোর পরিবেশনে কোন স্ক্রিপ্ট ব্যবহার করা হয় না। অনেক সময় বিভিন্ন চরিত্রে অভিনেতা, অভিনেত্রী তাৎক্ষণিকভাবে সংলাপ তৈরি করে ফেলেন।

আঞ্চলিক ভাষায় হুলি গান পরিবেশিত হবার কারণে ভাষার সহজ-সরল ব্যবহারের সাথে এ অঞ্চলের মানুষের সরলতার প্রকৃত রূপটিও সহজেই ধরা পড়ে। আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার হুলি গানের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসেবে বিবেচ্য।

৩.১৫. হুলি গানের পরিবেশনারীতি

পঞ্চগড় জেলার লোকনাট্য হুলি গানের তিন ধরণের পরিবেশনা লক্ষ করা যায়। মান পাঁচালির ঢঙে, রঙ পাঁচালি বা খাঁস পাঁচালির ঢঙে এবং আরেকটি যাত্রার ঢঙে। তবে মান পাঁচালি ও রঙপাঁচালি রীতিতেই বেশিরভাগ হুলি গান পরিবেশিত হয়ে থাকে। মান পাঁচালিকে শাস্ত্রীয় পাঁচালিও বলা হয়েছে। মান পাঁচালির আদলে হুলি গান হয় তত্ত্ব ও তথ্যমূলক। অনেকটা বিয়োগাত্মক পরিবেশনা হলো মান পাঁচালি। মান পাঁচালির হুলি গানে পূর্বে দেবস্তুতিমূলক পরিবেশনা হলেও বর্তমানে সামাজিক, রাজনৈতিক, পারিবারিক নানা অসঙ্গতি বিষয়বস্তু হিসেবে উপজীব্য। সামাজিক পালার পরিবেশনা হলো মান পাঁচালির হুলি গান। আর রঙ পাঁচালিতে সমাজের নানা বিষয়কে হাস্যরসাত্মকভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়ে থাকে। রঙ্গ-রসের মধ্যদিয়ে পারিবারিক, সামাজিক ঘটনাকে খুব সুচারুভাবে হুলি গানের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়ে থাকে।

“যিনি হুলির গানের কাহিনী রচনা এবং নির্দেশনা দান করেন তাকে কখনো বলা হয় 'সরকার' কখনো 'মাস্টার' আবার কখনো পরিচালক বলা হয়ে থাকে। আর হুলির গান পরিবেশনকারীদের 'গীদাল' বা 'গাউনিয়া' নামে, গানে সঙ্গতকারীদের ‘বাজনাদার’ অভিহিত করা হয়। এছাড়াও হুলি গানে ‘দোহার’ বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে।”[৭]

হুলিগান বৃহত্তর দিনাজপুর অঞ্চলে মাড়াঘুরা গান বা পালাটিয়া নামে অভিহিত। পালাটিয়া বা হুলির গান দুই ধরণের পরিবেশনা বেশি পরিলক্ষিত। “এ সম্পর্কে অচিন পাখি ইনফিনিটি গ্রন্থে বলা হয়েছে-

There are two types of Palatia Gan are commonly seen in greater Dinajpur district. These are (i) RangPacali and (ii) Sastriya Pacali (or Samajik Pacali).”[৮]

পঞ্চগড় জেলার হুলির গানে রঙ পাঁচালি ও শাস্ত্রীয় বা মান পাঁচালির পরিবেশনা দোলপূর্ণিমার উৎসব উপলক্ষ্যে একই ধামে পরিবেশিত হতে দেখা যায়। কোন কোন জায়গায় দুই তিন দিনব্যাপী হুলির গানের পরিবেশনা হয়ে থাকে। সেক্ষেত্রে প্রথমদিন রঙ পাঁচালির পরিবেশনা হলে পরের দিন মান পাঁচালির পরিবেশনা হয়ে থাকে। আবার, দোল পূর্ণিমা উলক্ষে একই দিনে রঙ পাঁচালি ও মান পাঁচালির পরিবেশনা দেখা যায়। তবে সেক্ষেত্রে ধাম আলাদা হয়ে থাকে। যেমন পঞ্চগড় সদর উপজেলার মির্জাপুর অঞ্চলের ধামে রঙ পাঁচালির আয়োজন করা হলে একই উপজেলার পার্শ্ববর্তী লাখেরাজ ঘুমটির ধামে মান পাঁচালির পরিবেশনা হয়ে থাকে। ফাল্গুন মাসে দোল উৎসব উপলক্ষে হুলির আয়োজন এক অন্যরকম আবহ সঞ্চার করে।

2019-3-24 00:59

আলোকচিত্র-১৯ : হুলি গানের আসর বন্দনা

৩.১৫.১. মান পাঁচালি

মান পাঁচালিকে শাস্ত্রীয় পাঁচালি বা সামাজিক পাঁচালিও বলা হয়। সামাজিক ও ঐতিহাসিক নানা বিষয় মান পাঁচালি বা শাস্ত্রীয় পাঁচালির বিষয়বস্তু হিসেবে উপজীব্য হয়ে ওঠে। মান পাঁচালি পরিবেশনে বর্তমানে সমাজের নানা অসঙ্গতি বিষয়বস্তু হিসেবে অন্তর্ভুক্ত। উল্লেখযোগ্য হল-

১। সাজানো সংসার ভেঙ্গে গেল
২। সুবোধ কুমার সুবিধা রাণী
৩। বৌমার পায়ে নমস্কার
৪। স্বামীর আদেশ
৫। বিয়ের আগে শাখা সিঁদুর
৬। সিঁদুর দিয়ো না মুছে
৭। কাজলের কান্না
৮। ঈশ্বরের চোখে জল
৯। গরীবের শেষ ফাইনাল
১০। ময়লা কাগজ
১১। মেয়ে ডাকাত
১২। সত্যের মৃত্যু নাই
১৩। শ্মশান ঘাটের কাঁচা কবরটা কার
১৪। চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা
১৫। স্বামীর চিতা জ্বলছে ইত্যাদি।

2019-3-24 01:22

আলোকচিত্র-২০ : মান পাঁচালির পরিবেশনা (ঈশ্বরের চোখে জল)

মান পাঁচালিতে আধুনিক ভাষায় সংলাপ উপস্থাপন করা হলেও ব্যবহৃত গানগুলো স্থানীয় ভাষায় রচিত এবং সুরও আঞ্চলিক। যেমন- ‘ঈশ্বরের চোখে জল’ নামের মান পাঁচালি বা সামাজিক পাঁচালিতে অভিনয়ের ক্ষেত্রে প্রমিত বাংলা ব্যবহারের রীতি দেখা যায়। কিন্তু গানের ক্ষেত্রে ভাষা ও সুরে কোন আধুনিকতা নেই। ‘ঈশ্বরের চোখে জল’ পাঁচালিতে একটি করুণ কাহিনী বর্ণিত হয়েছে এক নিম্নমধ্যবিত্ত কৃষক ‘ঈশ্বর’ চরিত্রকে কেন্দ্র করে। সে তার ছোটভাইকে সমস্ত জায়গাজমি বিক্রি করে পড়ালেখার খরচ জোগায় মস্তবড় উকিল বানানোর স্বপ্ন নিয়ে। কিন্তু তার স্বপ্নপূরণ হলেও সমাজের কিছু কুচক্রীমহল তাদের এই অভূতপূর্ব সাফল্য মেনে নিতে পারে না। ষড়যন্ত্রের জাল বিছিয়ে রাখে ঈশ্বরের পরিবারকে ধ্বংসের জন্য। গরীব কৃষক পরিবারের একজন সন্তান হয়ে মস্তবড় উকিল হয়েছে এটা জেনে একই গ্রামের স্বার্থন্বেষী তথাকথিত শহরে থাকা অসৎ ব্যবসায়ী চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে ঈশ্বরের ছোট ভাইকে নিজের কোম্পানিতে নিয়োগ দেয়। সেই খুশিতে ঈশ্বরের পরিবারের আনন্দের সীমা থাকে না। কিন্তু ষড়যন্ত্রের বেড়াজালে আটকা পড়তেই হয় এক সময়। মিথ্যে চুরির অভিযোগে ঈশ্বরের ছোটভাইকে ফাঁসানো হয়। যার কারণে জেল-জরিমানা বাবদ ঈশ্বর তার একমাত্র সম্বল ভিটেবাড়ি পর্যন্ত বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয়। একদিকে ছোট ভাইকে বাঁচানো অন্যদিকে ঈশ্বরের নিষ্পাপ সন্তানের অবহেলা অযত্নে নানা অসুখের বালাই।

এমতাবস্থায়, ঈশ্বর কি করবে ভেবে কূল পায় না। এমনি জটিল আবহে ঘটনা মোড় নেয়। শেষ পরিণতি হিসেবে ঈশ্বর বসতভিটে বিক্রি করে আপন ছোট ভাইকে রক্ষা করতে পারলেও আপন নিষ্পাপ সন্তানকে বাঁচানোর কোন

উপায় থাকে না। মৃত সন্তানকে কোলে নিয়ে ঈশ্বর ও স্ত্রী বিলাপের মহাসমুদ্রে ভাসতে থাকে। ঈশ্বরের ছোট ভাই নিজেকে অভিশপ্ত ও অপরাধী ভাবতে থাকে। নিজের পড়ালেখা ও মিথ্যে মামলায় পরিবারকে পথে বসানোর জন্য একমাত্র দায়ী সে। এমনি করুণ ঘটনা প্রবাহের মধ্য দিয়ে কাহিনীর সমাপ্তি হয়। সংলাপ, গীত, নৃত্য ও অভিনয়ের সম্মিলনে ঐতিহাসিক নাট্যধারায় হুলি গানের মান পাঁচালি "ঈশ্বরের চোখে জল'-এর পরিবেশনা এক অনবদ্য লোকনাট্য হিসেবে উপস্থাপিত হয়।

৩.১৫.২. রঙ পাঁচালি পরিবেশনা

পঞ্চগড় জেলার ঐতিহ্যবাহী লোকনাট্য হুলি গানের অন্যতম পরিবেশনারীতি হলো রঙ পাঁচালি। মান পাঁচালি বা সামাজিক পাঁচালি বা শাস্ত্রীয় পাঁচালিতে যে বিলাপের মাধ্যমে করুণ পরিণতির মাধ্যমে কাহিনীর সমাপ্তি ঘটে তার ঠিক উল্টো ঘটে রঙ পাঁচালিতে। রঙ পাঁচালি হলো সমাজের নানা বিষয়কে ব্যঙ্গাত্মক ও হাস্যরসাত্মকভাবে উপস্থাপিত এক বিশেষ পরিবেশনারীতি। পাঁচালি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, "বোলানের পাঁচালিকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে- পালা পাঁচালি ও রঙ পাঁচালি। পালার কাহিনীর শেষ অংশ পাঁচালির সুরে গাওয়াকে বলা হয় পালা-পাঁচালি। আর রঙ্গরসে ভরপুর পাঁচালিকে বলা হয় রঙ পাঁচালি।"[৯] এছাড়া, রঙ পাঁচালি গানে যে কয়জন শিল্পী পাঁচালীর চরিত্রে অংশগ্রহণ করে তারা দাঁড়িয়ে যায়। বাজনার দল বসে বসে বাজায়। পাঁচালি গানে প্রথমে 'ধুয়ো' গাওয়া হয় এবং আসরে বসে থাকা শিল্পী ও দোহারগণ মাঝে মাঝে গেয়ে ওঠে।

পঞ্চগড় জেলার 'খাস পঁচালী' বা 'রঙ পাঁচালি'র কাহিনী ও নামকরণ অনেকটা মজার। যেমন-

১। পেঁচকেটার সংসার
২। বিশ্ব হাদাংকালী
৩। বেঙ্গন পহড়া
৪। আগুনশ্বরী বৌমা জব্দ ঢেনা
৫। মফিজুল ফাতেরা
৬। বেকার আজেলা
৭। জলডং ঢেনা
৮। মুড়ি বেচি
৯। ভাকা বেচি
১০। রেল ফাতেরা ইঞ্জিনশরী

১১। চানতারা পূর্ণিমাশরী
১২। লালটিয়া গোঁসাই ঝাকালিশরী
১৩। চৌদ্দ গোঁসাই অতালশরী
১৪। নয়নবালা
১৫। অধম চাষা
১৬। হেবেল সতী
১৭। সাইকেলশরী হেন্ডেল ফাতেরা
১৮। চাষার ভাগ্যে অমলা দেবী
১৯। রসের বিহানী
২০। জং ছুটা হাতুড়ি
২১। কুলাডাঙ্গা
২২। রঙ্গিলা ঠাকুর
২৩। জনতাবালা ইত্যাদি।

পঞ্চগড় জেলার হুলি গানের শুরুতেই সরকার বা ম্যানেজার তারপর এক এক করে কুশিলবগণ দাড়িয়ে দর্শকদের দিকে তাকিয়ে আসর বন্দনা করেন। এ জেলার হুলি গানের আসর বন্দনা নিম্নরূপঃ

"এইবার বন্দনা করেছি রে শান্তি-সমাচার,
ওই বুদ্ধিমান হইলো সরকার।
ওরে, রাস্তায় রাস্তায় গাছ লাগাইছে
মেয়ে মানুষে দ্যাছে পহড়া।
ওকি ও ভাইরে-
ওই যে কিষক নোকের কপাল ভালো,
চায়না-বুরো আবাদ করো,
ওরে চায়না-বুরো আবাদ করে-
দেশের অভাব দূর করে।

ও এইবার,
বন্দনা করেছি রে শান্তি সমাচার-
ওই বুদ্ধিমান হইলো সরকার,
ওরে, রাস্তায় রাস্তায় গাছ নাগাইছে,
মেয়ে মানুষে দ্যাছে পহড়া...

ওকি ও ভাইরে-
ওই যে গরিব নোকের খাবার হাটত্
টাকা পাইসা নাইরে নগত।
ওরে, কামের উপর টাকা নিয়া
খরচ করছে সবার পাছত ॥"[১০]

পঞ্চগড় জেলার হুলি গান 'বেঙ্গন পহড়া' পালার মূল কাহিনী হচ্ছে, একদিন এক বোকা জামাই তার শ্বশুড় বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হয়। খালি হাতে শ্বশুরবাড়ি গেলে খারাপ দেখাবে বলে পথিমধ্যে অপরিচিত এক বেগুনের জমি থেকে বেগুন চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে। বেগুন চাষির সাথে বাক-বিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়ে। এক পর্যায়ে তাদের মধ্যে ধস্তাধস্তি শুরু হয়। প্রথমদিকে, একে অপরকে চিনতে না পারলেও বেশ কিছু কথাবার্তার পর যখন শ্বশুড় তার জামাইকে চিনতে পারে তখন সে তার জামাইকে একটি প্রস্তাব দেয়। প্রস্তাবটি হলো সে অনেক কষ্ট করে বেগুনের চাষ করেছে। সন্ধ্যাবেলা হয়ে এলো বাজারেও যেতে হবে। আবার বেগুনের জমি সন্ধ্যাবেলা বেগুন পাহাড়া না দিলে এলাকার লোকজন চুরি করার সমূহ সম্ভাবনা আছে বলে জামাইকে সন্ধ্যা অবধি বেগুন পাহাড়া দিতে হবে। জামাই সেই প্রস্তাবে রাজি হয়ে যান। কিছুক্ষণ পর বেগুন তোলার জন্য এক ভদ্র মহিলার আগমন ঘটে। ভদ্রমহিলা মাথায় ঘোমটা দিয়ে এসে বেগুন তোলা শুরু করলে বেগুন পাহাড়ায় নিযুক্ত জামাই সেই মহিলার সাথে বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়ে। এক পর্যায়ে জামাই ঐ ভদ্রমহিলাকে প্রহার করতে থাকলে এক কথা দু'কথায় তার আসল পরিচয় জানতে পারে। তখন শাশুড়ি জামাইকে উদ্দেশ্য করে যা বলেন তা নিম্নরূপঃ

"ছিঃ রে, ছিঃ রে
জুয়াই বেটা-
নইজ্যা নাইরে তোর,
মইনসির আগত্ উপকলঙ-
তুই উঠালো মোর।

জুয়াই এত কইলেন তাই-বাই,
ধর্ম-কর্ম তুমহার কিছুই নাই,
জুয়াই হয়া নাড়িয়া ফেলালেন
মোর গাও ॥"[১১]

ভদ্রমহিলা তার সম্পর্কে শ্বাশুড়ি হয়, একথা পরে জানতে পেরে জামাই খুব লজ্জা ও অনুতাপ করতে থাকে। তারপর জামাই তার শাশুড়ির নিকট ক্ষমা প্রার্থণা করে বলে তিনি মাথায় ঘুমটা দিয়ে থাকার কারণে চিনতে পারেনি, সে বড় অন্যায় হয়ে গেছে। এবারের মতো সন্তান হিসেবে মাফ চায়। শাশুড়ির নিকট জামাইয়ের ক্ষমা প্রার্থণার নমুনা এরূপঃ

"আজি পাও ধরিয়া কহছু গে নেহরা,
মোর শশুড়ের বাড়ি মিয়াভিটা,
মোর শশুড়ের নাম ধনসুরা বুড়া,
মোর নামডা হছে নেঠালাগা॥"[১২]

শ্বাশুড়ি তাঁর ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরে তার জামাইয়ের জন্মপরিচয় নিয়ে অকথ্য ভাষায় কিছুক্ষণ গালিগালাজ করে। আবার এদিকে, তার নতুন বৌ-এর সাথে এলাকার একজনের পরকিয়া প্রেম রয়েছে। সেই কাহিনীও জটিল রূপ ধারণ করে। বিরহী নারীর করুণ আর্তি প্রকাশ পায় তার নমুনা নিম্নরূপঃ

"আজি ফুলের যেমন ভমর-
আছে রে দাদা,
নায়ের আছে মাঝি।
মুই নারীডা অভাগিনী রে,
সঙ্গে নাই মোর সাথী।

আজি গাছের সবাং লতা-পাতা রে ও দাদা,
বাড়ির সবং নারীকেল গুয়া,
নারীর সবাং শাখা-সিন্দুঁরে-
মায়ের সবাং কলার ছাওয়া।

আজি মুই অ দুফুল বাগিচা
মোকুন্না রে মোকুন্না,
তুই মোর ভমরা,
ফুটা ফুলের মধু খা তুই রে,
ও তুই ডালতে বসিয়া-
ও তুই ফুলতে বসিয়া॥"[১৩]

তবে হাস্যরসাত্মক উপস্থাপনার আধিক্যেই রঙ পাঁচালি হিসেবে বেগুণ পাহাড়া বা বেঙ্গন পহড়ার কাহিনীর সমাপ্তি ঘটে।

পঞ্চগড় জেলার হুলি গানের মান পাঁচালি ও রঙ পাঁচালি উভয় পরিবেশনাশৈলীর জন্য মঞ্চ বা আসরের ধরণ একই। ১৪ বর্গফুট বর্গাকারে দেড় থেকে দুই ফুট উঁচু মাটির ধামে হুলি গানের পরিবেশনায় হিন্দু-মুসলমান দুই ধর্মের অনুসারীর অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা যায়। স্থায়ী বা অস্থায়ী ধামে সারারাতব্যাপী হুলির গানের পরিবেশনা গ্রামের সাধারণ মানুষের উপভোগের এক বিশেষ বিনোদন হিসেবে স্বীকৃত। মান পাঁচালি ও রঙ পাঁচালির পরিবেশনার ক্ষেত্রে পরিবেশনার উপকরণ ও পোশাকের ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়। রঙ পাঁচালির ক্ষেত্রে কুশিলবদের গ্রামের খেটে খাওয়া সাধারণ কৃষক শ্রেণীর চিরায়ত রূপ ফুটে ওঠে।

অপরদিকে, মান পাঁচালি বা শাস্ত্রীয় বা সামাজিক পাঁচালির পরিবেশনায় বিষয়বস্তু অনুযায়ী চরিত্রের মধ্যে আধুনিক পেশার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। যেমন- জর্জ, উকিল, পুলিশ, দারোগা, জমিদার, মাতব্বর, শিক্ষক, সরকারী-বেসরকারী কর্মকর্তা, পীর, চাকর-বাকরসহ আরো বেশ কিছু চরিত্রের উপস্থিতি দেখতে পাওয়া যায়। মান পাঁচালি ও রঙ পাঁচালি দুই ধরণের পরিবেশনা শুরু হয় বন্দনার মধ্য দিয়ে। কুশিলবগণ প্রথমে মঞ্চে দাঁড়িয়ে এমনকি ঘুরে ঘুরে আসর বন্দনা করে থাকেন। এরপর মূল পর্ব শুরু করার পূর্বে মঞ্চের মাঝখানে অবস্থান করা বাদ্যযন্ত্র শিল্পীদের কিছুক্ষণ কনসার্ট বা বাদ্যের সম্মেলিত পরিবেশন হয়ে থাকে।

পঞ্চগড় জেলার হুলির গানের সাথে দিনাজপুর ও ঠাকুরগাঁও জেলার হুলির গানের বেশ সাদৃশ্য রয়েছে। পঞ্চগড় জেলায় পরিবেশিত হুলির গানকে ঠাকুরগাঁও ও দিনাজপুর জেলায় ধামের গান' বা 'পালাটিয়া' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। বিষয়বস্তুগত বৈচিত্র্য থাকলেও পরিবেশনার আঙ্গিকগত সাদৃশ্য রয়েছে। তবে গানের সুর ও ভাষাগত কিছুটা ভিন্নতা থাকলেও মঞ্চ বা ধামের তেমন কোন বৈসাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায় না। আবার, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি জেলায় হুলি গানকে 'মাড়াঘুরা গান' হিসেবে অবহিত করা হয়। পঞ্চগড় জেলা ১৯৪০ সাল পর্যন্ত জলপাইগুড় জেলার অধীনে ছিল। যে কারণে লোকজ সংস্কৃতির অভিন্নতা বেশ লক্ষ্য করা যায়। জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর জেলার ঐতিহ্যবাহী লোকনাট্যের পরিবেশনার অনেক মিল রয়েছে একথা অনস্বীকার্য।

তবে, পরিবেশনাশৈলীর দৃষ্টিকোণ থেকে পঞ্চগড় জেলার 'হুলির গান' নিঃসন্দেহে একটি জনপ্রিয় লোকনাট্য হিসেবে বিবেচ্য। বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী লোকনাট্যের সকল বৈশিষ্ট্য হুলির গানের পরিবেশনা রীতির মধ্যে ফুটে ওঠে। কাজেই, ঐতিহ্যবাহী নাট্যের ধারায় এ জেলার জনগোষ্ঠীর দীর্ঘদিনের লালিত মিশ্র পরিবেশনা হুলির গানের পরিবেশনাশৈলী বাংলাদেশের পরিবেশনা শিল্পে এক যগান্তকারী সংযোজন হিসেবে অনুকরণীয় শিল্পমাধ্যম রূপে ভূমিকা পালন করবে বলে গবেষক বিশ্বাস করেন।

নিম্নে হুলি গানের স্থায়ী মঞ্চের আলোকচিত্র তুলে ধরা হলোঃ

2019-8-21 19:56

আলোকচিত্র-২১ : হুলি গানের স্থায়ী ধাম বা মঞ্চ (মালাদাম বাজার, পঞ্চগড়)

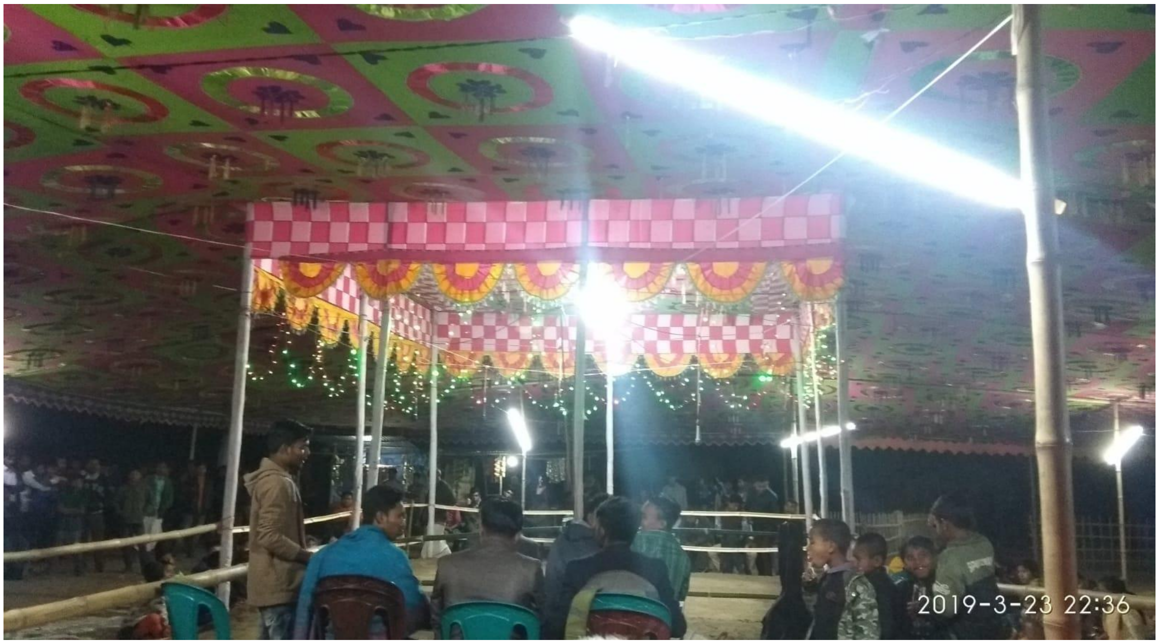
2019-3-23 22:36

আলোকচিত্র-২২ : হুলি গানের মঞ্চে আধুনিক আলোকসজ্জার ব্যবস্থা (লাখেরাজ ঘুমটি, মাগুরা, পঞ্চগড়)

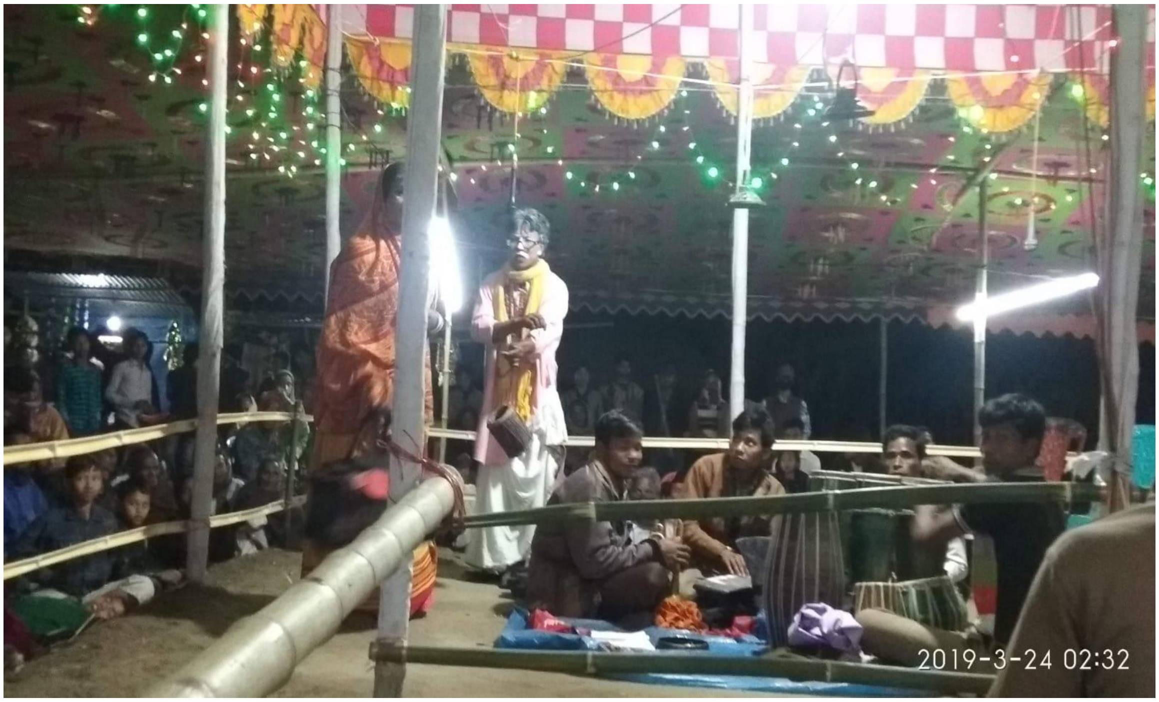
2019-3-24 02:32

আলোকচিত্র-২৩ : হুলি গানের পরিবেশনায় মূল মঞ্চের মাঝখানে বাদকদের অবস্থান (লাখেরাজ ঘুমটি, পঞ্চগড়)

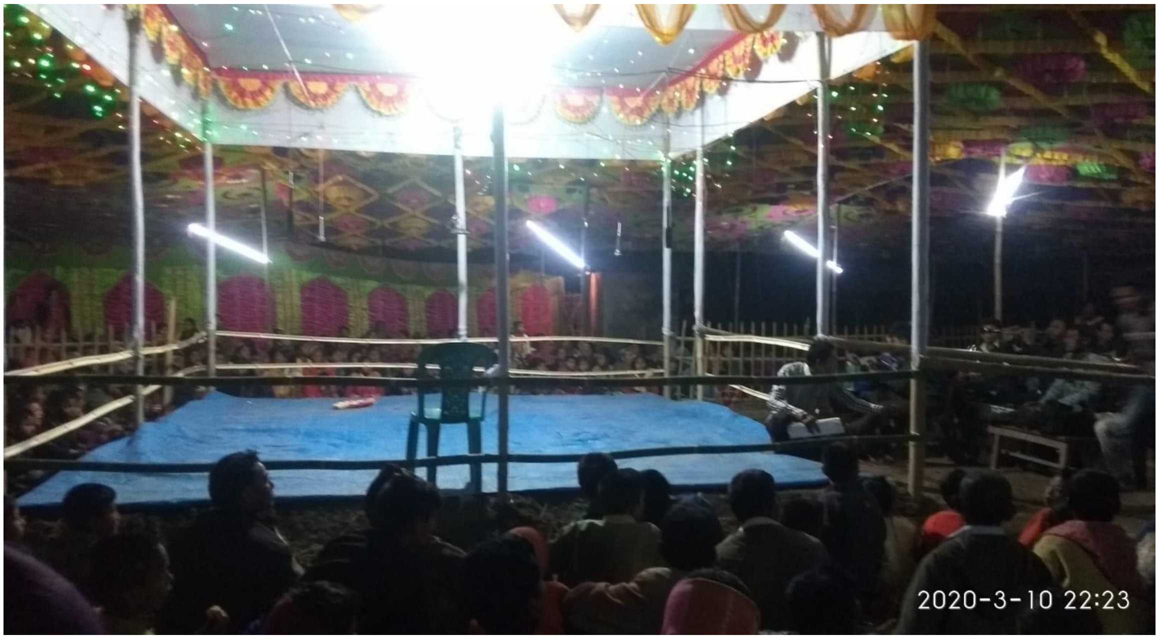
2020-3-10 22:23

আলোকচিত্র-২৪ : হুলি গানের আসরে দর্শকের অবস্থান (মির্জাপুর, পঞ্চগড়)

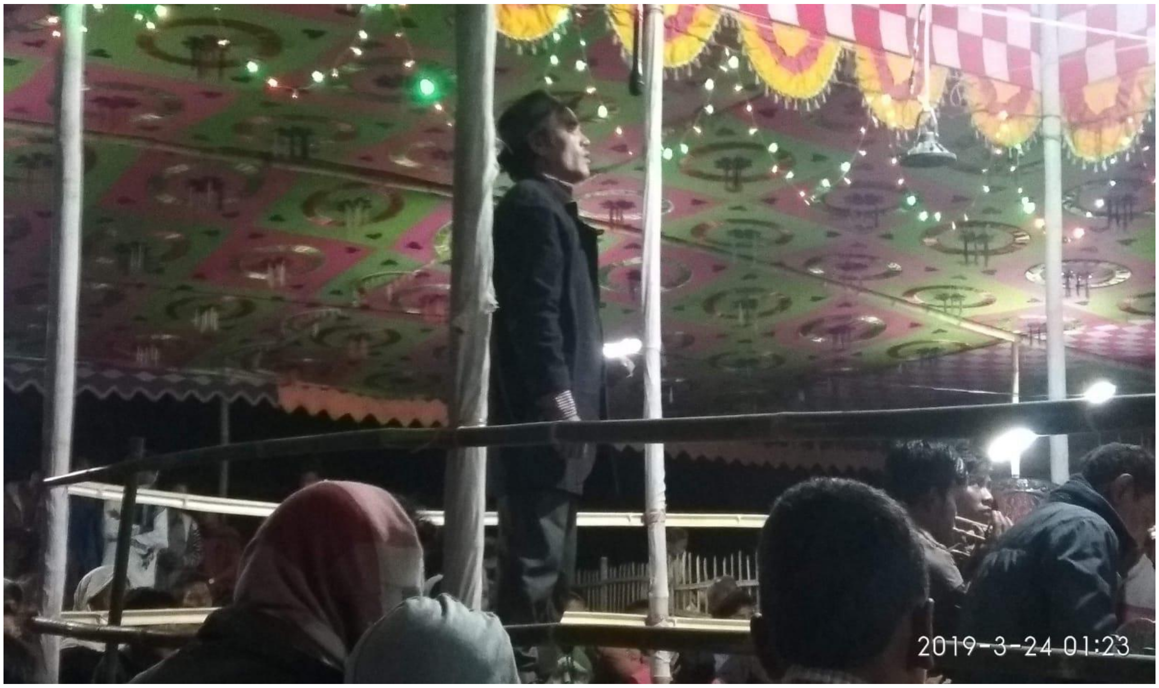
2019-3-24 01:23

আলোকচিত্র-২৫ : হুলি গানের মঞ্চের উপরে ছামিয়ানার ব্যবহার (লাখেরাজ ঘুমটি, মাগুরা, পঞ্চগড়)

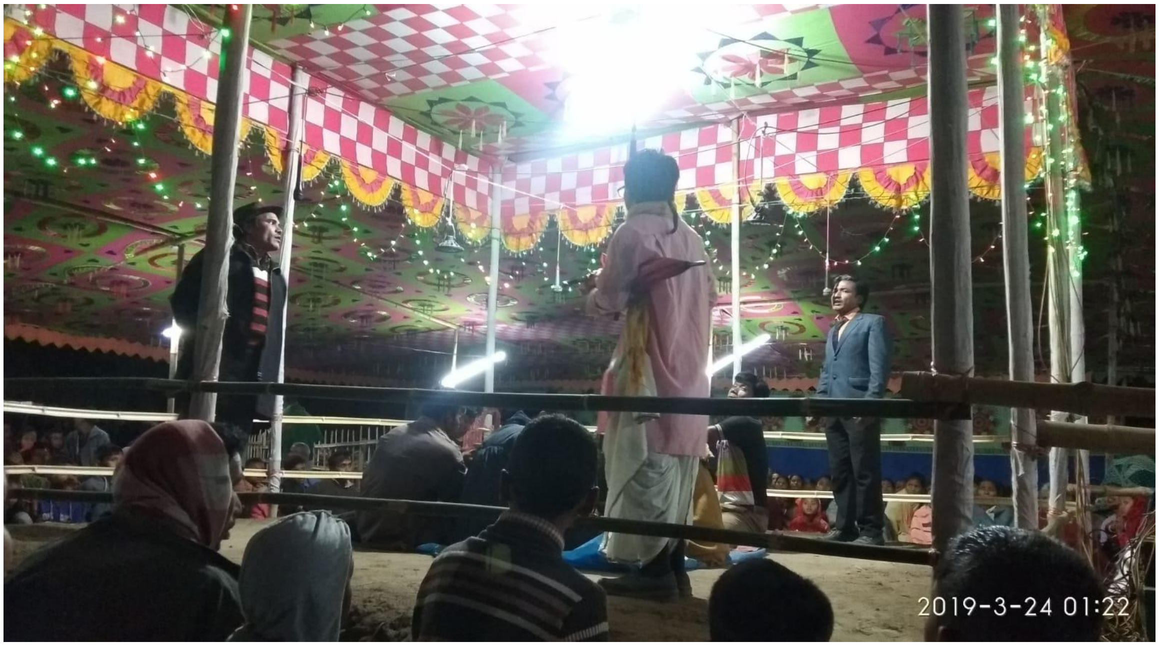
2019-3-24 01:22

আলোকচিত্র-২৬ : হুলি গানে মূল মঞ্চের চারপাশে বাঁশের বেড়ার ব্যবস্থা (লাখেরাজ ঘুমটি, পঞ্চগড়)

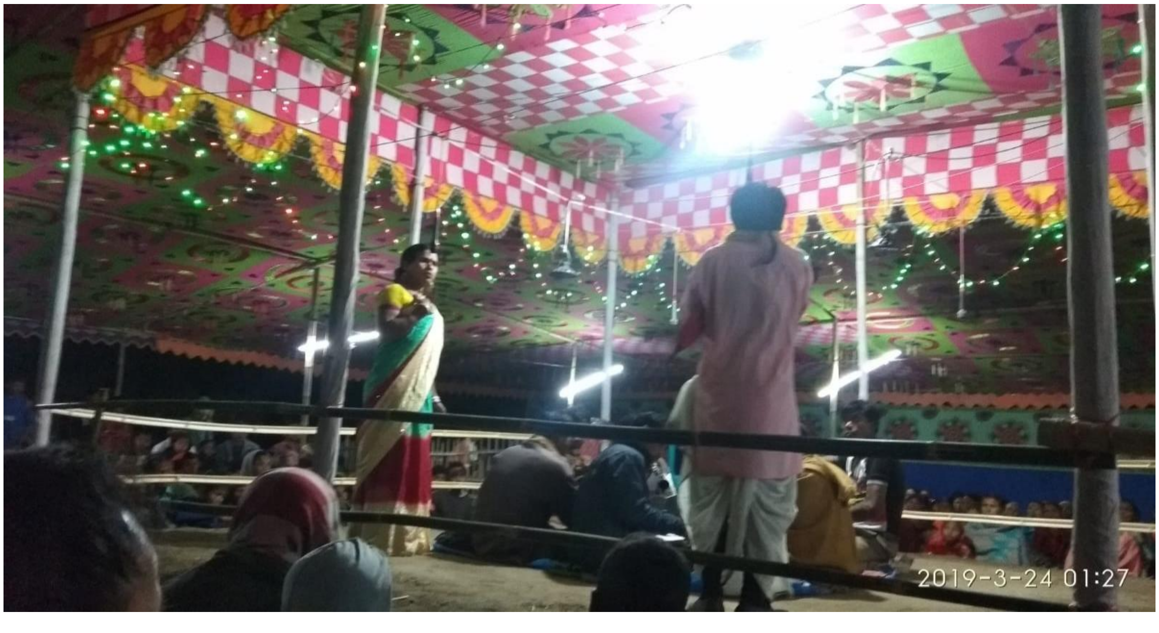
2019-3-24 01:27

আলোকচিত্র- ২৭ : হুলির মান পাঁচালী পরিবেশনা

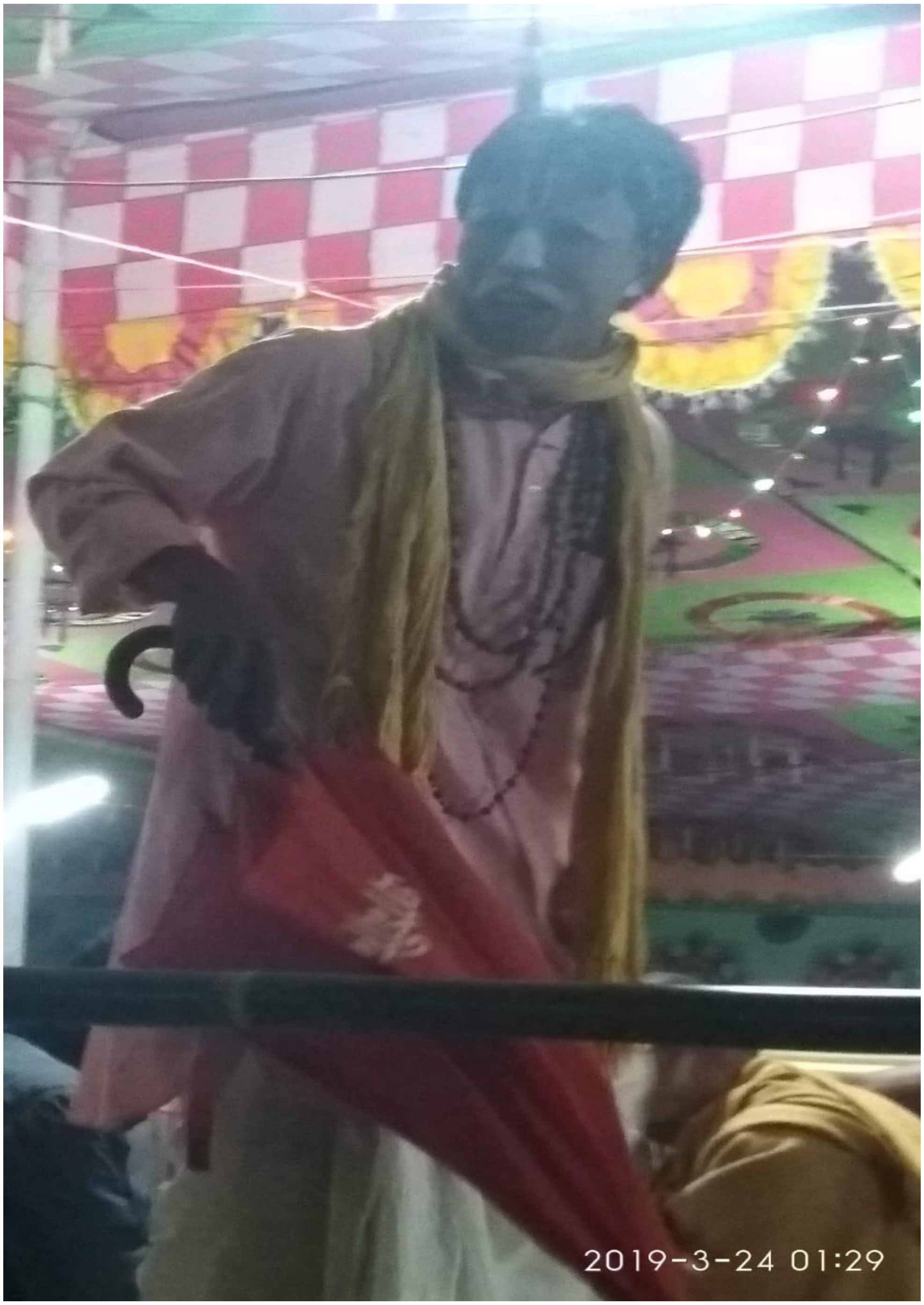
2019-3-24 01:29

আলোকচিত্র- ২৮ : হুলি গানে ‘ভাড় চরিত্র’ (মাগুরা, পঞ্চগড়)

তথ্যনির্দেশ:

১. শামসুজ্জামান খান (সম্পা.), *বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা: পঞ্চগড়*, বাংলা একাডেমি, ২০১৩, পৃ. ১৬৭

২. সাইমন জাকারিয়া, *বাংলাদেশের লোকনাটক: বিষয় ও আঙ্গিক বৈচিত্র্য*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ২

৩. সেলিম আল দীন, *মধ্যযুগের বাঙলা নাট্য*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১৮, পৃ. ১৮

৪. সেলিম আল দীন, *মধ্যযুগের বাঙলা নাট্য*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১৮, পৃ. ৭-৯

৫. সাইমন জাকারিয়া, প্রাচীন বাংলার বুদ্ধ নাটক, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ৬৫-৭০

৬. শ্রী বাসুদেব রায়, বয়স-৭০, সময় ও তারিখ- দুপুর ০৩:১০ ,৩১-০৮-২০২১, সুন্দরদীঘি, দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড়।

৭. শামসুজ্জামান খান (সম্পা.), *বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা: পঞ্চগড়*, বাংলা একাডেমি, ২০১৩, পৃ. ১৬৭

৮. Syed Jamil Ahmed, *Acin Pakhi Infinity: Indigenous Theatre of Bangladesh*, The University Press Limited, 2000, p. 290

৯. তাপস কুমার বন্দোপাধ্যায়, পাঁচালিকার ও বোলান গানের ইতিবৃত্ত, প্রতিভাস, কলকাতা, পৃ. ২১

১০. পোহাতু বর্মন (বয়স-৭০), সময়: রাত ১১:০০, ৫ সেপ্টেম্বর ২০২১, লাখেরাজ ঘুমটি মন্দির মাঠ, মাগুরা, পঞ্চগড়।

১১. পোহাতু বর্মন (বয়স-৭০), সময়: রাত সাড়ে ১২টা, ৬ সেপ্টেম্বর ২০২১, লাখেরাজ ঘুমটি মন্দির মাঠ, মাগুরা, পঞ্চগড়।

১২. সুবাস, হীরেন, দয়াল বর্মণ, ঈশক প্রমুখের সম্মিলিত কণ্ঠে, সময়- রাত ১২টা ৫০ মিনিট, তারিখ ৬-৯-২০২১, লাখেরাজ ঘুমটি মন্দির মাঠ, মাগুরা, পঞ্চগড়।

১৩. পোহাতু বর্মণ, সময়- রাত ১২:৫০টা, তারিখ ৬-৯-২০২১, লাখেরাজ ঘুমটি মন্দির মাঠ, মাগুরা, পঞ্চগড়।

চতুর্থ অধ্যায়

দর্শক ও শিল্পীদের দৃষ্টিতে হুলি গানের বর্তমান অবস্থা ও সম্ভাবনা

পঞ্চগড় জেলার লোকসংস্কৃতির ভান্ডার বেশ সমৃদ্ধ। এ জেলার লোকসংস্কৃতির ভান্ডারকে পূর্ণতা দান করেছে লোকসাহিত্যের নানা উপাদান। এ অঞ্চলের লোকসাহিত্যের নানা উপাদানের মধ্যে লোকনাট্য একটি বিশেষ জায়গা দখল করে আছে। পঞ্চগড় জেলার 'হুলি গান' একটি জনপ্রিয় লোকসংগীত ও লোকনাট্য হিসেবে দীর্ঘদিন পরিচিত হয়ে আসছে। তবে পূর্বের তুলনায় জনপ্রিয় এই পরিবেশনার বর্তমান অবস্থা খুব একটা সুবিধার নয়। পূর্বের তুলনায় জনপ্রিয় এই পরিবেশনা জেলার বিভিন্ন স্থানে খুব কম পরিবেশিত হতে দেখা যায়। আগে যেমন বিভিন্ন পূজা-পার্বণ উৎসবাদিতে, বাংলার লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন উৎসবকে কেন্দ্র করে হুলি গানের পরিবেশনা হত, সেই তুলনায় এখন এর আয়োজন অনেক কমে গেছে। করোনা মহামারীর প্রতিবন্ধকতা স্বত্ত্বেও বেশ কয়েকজন প্রবীণ কুশীলব ও প্রবীণ দর্শক, নাট্যকার ও গবেষকের সাক্ষাৎকার নেওয়ার সুযোগ হয়েছিল। দেবীগঞ্জের প্রবীণ অভিনেতা ও পালার সরকার বাসুদেব রায় মনে করেন, হুলি গান আমাদের পঞ্চগড়ের লোক ঐতিহ্য। সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে জনপ্রিয় ও ঐতিহ্যবাহী এই পরিবেশনার বর্তমান অবস্থা খুবই শোচনীয়। পূর্বের তুলনায় হুলি গানের দলগুলো অনেকাংশে কমে গেছে, এমনকি যেসব দল হুলি গান পরিবেশন করে থাকে সেগুলো ধীরে ধীওে হারিয়ে যাওয়ার পথে। এমতাবস্থায়, সমাজের বিত্তবানদের পৃষ্ঠপোষকতা, স্থানীয় প্রশাসনের পৃষ্ঠপোষকতা, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি পঞ্চগড় জেলা শাখার কার্যকরী পদক্ষেপ ও তাদের সুনজর হুলি গানের ঐতিহ্যবাহী ধারাকে যুগ যুগ ধরে বহমান রাখতে সক্ষম। হুলি গানের প্রবীণ দর্শক পঞ্চগড়ের লোকসাহিত্য গবেষক, শিক্ষাবিদ ও সংগঠক শফিকুল ইসলাম স্যারের ভাষ্যমতে, হুলি গান পঞ্চগড় এবং সন্নিহিত অন্যান্য এলাকায় প্রচলিত একটি প্রাচীন নাট্যরীতি। এটি এলাকাভেদে 'ধামের গান', 'হুলির ধাম' এসব নামেও প্রচলিত। নীতিকথা সম্বলিত উপাখ্যান বা সমাজ চিত্রকে কুশীলবগণ মঞ্চের চারপাশে চক্রাকারে বসে থাকা দর্শকগণের সামনে ঘুরে ঘুরে অভিনয় ও গীত সহযোগে উপস্থাপন করে থাকেন। যন্ত্রানুষঙ্গ এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এতে ঢোল, কাশর, বাঁশি, সারেঙ্গি ইত্যাদি যন্ত্র ব্যাবহৃত হয়ে থাকে। এই নাট্যরীতিতে পুরুষরাই নারী চরিত্রেও অভিনয়শিল্পীর ভূমিকা পালন করে। তিনি মনে করেন সুদীর্ঘকাল ধরে একটি শিল্প ঐতিহ্যকে বহন করে চললেও সমাজে হুলির গানের শিল্পীরা মূল ধারার অন্যান্য শিল্পীদের মত সমাদৃত নয়। তাদেরকে উপেক্ষিত প্রান্তজন হিসেবেই টিকে থাকার সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হচ্ছে এবং নাগরিক সংস্কৃতির দাপটে প্রান্তজনের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য অনেক কাল ধরেই হুমকির মুখে। এটি অন্যান্য ধারার লোকশিল্পীদের

ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। জীবিকার তাগিদে অনেক শিল্পীই অন্য পেশা বেছে নিচ্ছেন। নতুন শিল্পী তৈরি হওয়ার পথও সঙ্কুচিত হয়ে পরেছে। পৃষ্ঠপোষকতা নামমাত্র। যে দলের একটু সুনাম আছে তারা কালেভদ্রে জেলা বা উপজেলা সদরে কোন কোন সংস্থার আমন্ত্রণে পালা করার সুযোগ পায়। সামান্য সম্মানীও হয়ত পায়। কিন্তু এই শিল্প তার সকীয়তা নিয়ে টিকে থাকতে পারবে, এমন কোন পৃষ্ঠপোষকতা চোখে পড়ে না।

পঞ্চগড় জেলার হুলি গানের কুশীলবদের বর্তমান অবস্থা খুব একটা ভালো না। সমাজে তাদের অবস্থান খুবই অবহেলিত। বর্তমানে পঞ্চগড় জেলার কয়েকটি জনপ্রিয় হুলি গানের দলের মধ্যে মহেশ বাবুর হুলির গানের দল (তেতুলিয়া, পঞ্চগড়), মারেয়া হুলি গানের দল (বকশীগঞ্জ, বোদা, পঞ্চগড়), পাল্টাপাড়া হুলির গানের দল (আটোয়ারী পঞ্চগড়), চুচুলি বটতলী হুলি গানের দল (বোদা, পঞ্চগড়), উৎকুরা হুলির গানের দল (বোদা, পঞ্চগড়), বাসুদেব বাবুর হুলির গানের দল (দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড়) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এই দলগুলোর সবকটি নিয়মিত এখন পরিবেশন করছে না, সামাজিক পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে দলগুলো আজ বিলুপ্তির পথে। মহেশ চন্দ্র বাবুর পরিবেশিত জনপ্রিয় পালার মধ্যে কাজল রেখা, হীরা মানিক, ফাইনাল বুড়া, কলঙ্কিয়া, বটুয়া ডাকু প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। হুলির গানের কুশীলবদের মধ্যে পোহাতু বর্মন, জয়ন্ত, সুভাষ, দয়াল বর্মন, হিরেন চন্দ্র রায়, চন্দন রায়, বধূ রায়, পাখি রায়, কেরু রায়, বাহেরু রায়, তালিমুদ্দিন, জলিল, আলিম, আলম, সামন্ত প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। তাঁরা প্রায় সকলে মহেশ বাবুর হুলির গানের পরিবেশনায় অভিনয় করেছেন। এদের মধ্যে মহেশ বাবুর প্রধান শিষ্য পোহাতু বর্মন ও বাসুদেব রায়ের সাথে কথা বলে জানা যায়, ঐতিহ্যবাহী লোকনাট্য হুলি গানকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে আগে কুশিলবদের প্রতি সমাজের, স্থানীয় প্রশাসনের, পঞ্চগড় শিল্পকলা একাডেমির সুনজর থাকা দরকার এবং হুলি গানের কুশিলবদের আলাদা তালিকাকরণ ও স্বল্প পরিমাণে হলেও ভাতার ব্যবস্থা করা। নাট্যকর্মী ও সাংবাদিক সরকার হায়দার মনে করেন, পৃষ্ঠপোষকতার অভাবেই হুলি গানের কুশিলবদের আজকাল বিভিন্ন পেশায় জীবিকার তাগিদে নিয়োজিত।

আমাদের ঐতিহ্যবাহী লোকনাট্য হুলি গানকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে পৃষ্ঠপোষকতার পাশাপাশি হুলি গানের শিল্পীদের তালিকা প্রণয়ন এবং তাদেরকে উন্নত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, হুলি গান পরিবেশনায় আধুনিকায়ন করা এবং টিকিট কেটে যেন হুলিগান দেখে সেই পরিবেশ তৈরি করার পদক্ষেপ গ্রহণ সময়ের দাবি। এসব করতে পারলে হুলি গান যুগ যুগ ধরে বেঁচে থাকবে। পঞ্চগড়ের জনপ্রিয় লোকগান ও লোকনাট্য হুলি গানের চর্চা ও পরিবেশনার ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে হলে সাংস্কৃতিক মহলের পাশাপাশি স্থানীয় প্রশাসন ও রাষ্ট্রীয় পৃষ্টপোষকতার কোন বিকল্প নেই। সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়, শিল্পকলা একাডেমি এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ফোকলোর বিভাগকে দেশের লোকসংস্কৃতি

রক্ষায় সুচিন্তিত ও সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহন করা আবশ্যক। লোকজ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মূল্য ও গুরুত্ব সাধারণের মাঝে তুলে ধরা সম্ভব না হলে এগুলো বিলীন হয়ে যেতে পারে। এদশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মূল্য ও গুরুত্ব সাধারণের মাঝে তুলে ধরা সম্ভব না হলে এগুলো বিলীন হয়ে যেতে পারে। হুলি গানের পরিবেশনা ছড়িয়ে পড়ুক সারা বাংলায়, নতুন করে বেগবান হোক তার ধারা। নতুন প্রজন্ম জানুক তার আদি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যবাহী পরিবেশনার স্বরূপ।

হুলি গানের কতিপয় প্রবীণ শিল্পী ও প্রবীণ শ্রোতাদের সাক্ষাৎকার নিম্নে তুলে ধরা হলো ঃ

সাক্ষাৎকার ১

(মোঃ শফিকুল ইসলাম, গবেষক, প্রাবন্ধিক। অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, বয়স ৬৬, বাড়ি- শিংপাড়া, পঞ্চগড় সদর, পঞ্চগড়)

গবেষক : স্যার, আস্সালামু আলাইকুম।

শফিক স্যার : ওয়ালাইকুমুস্সালাম।

গবেষক : স্যার কেমন আছেন?

শফিক স্যার : হ্যা, ভাল আছি। কি খবর তোমার? সবকিছু ঠিকমতো চলছে?

গবেষক : জী স্যার, সব মিলিয়ে আছি কুশলেই। পঞ্চগড়ের ঐতিহ্যবাহী লোকসঙ্গীত হুলির গান সম্পর্কে একটু যদি বলতেন?

শফিক স্যার : হুলির গান পঞ্চগড় এবং সন্নিহিত অন্যান্য এলাকায় প্রচলিত একটি প্রাচীন নাট্যরীতি। এটি এলাকাভেদে ধামের গান, হুলির ধাম এসব নামেও প্রচলিত। নীতিকথা সম্বলিত উপাখ্যান বা সমাজচিত্রকে কুশীলবগণ মঞ্চের চারপাশে চক্রাকারে বসে থাকা দর্শকগণের সামনে ঘুরে ঘুরে অভিনয় ও গীত সহযোগে উপস্থাপন করে থাকেন। যন্ত্রানুষঙ্গ এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এতে ঢোল, কাশর, বাঁশি, সারেঙ্গি ইত্যাদি যন্ত্র ব্যাবহৃত হয়ে থাকে। এই নাট্যরীতিতে পুরুষরাই নারী চরিত্রে অভিনয় শিল্পীর ভূমিকা পালন করে।

গবেষক : হুলি গান সরাসরি উপভোগ করার সুযোগ হয়েছে কিনা যদি বলতেন?

শফিক স্যার : হ্যা, একাধিকবার দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। তবে গ্রামীন জনগোষ্ঠীর সাথে গ্রামীন পরিবেশে দেখা হয়ে উঠেনি। আমি এই নাট্যশিল্পের আস্বাদ নিয়েছি শহরে পরিবেশে শহুরে লোকজনের সাথে। তাই হুলির গানের উপযোগী মঞ্চ ও আসন ব্যাবস্থাপনা থাকলেও শিল্পটির সত্যিকারের আস্বাদ থেকে হয়ত বঞ্চিতই আছি।

গবেষক : হুলি গানের বর্তমানে বিষয়বস্তুর কোনো পরিবর্তন হয়েছে কিনা?

শফিক স্যার : দেশ কাল এবং গ্রামজীবনে নানা পরিবর্তনের অভিঘাতে হুলির গানের বিয়য়বস্তুর মধ্যেও নানা পরিবর্তন পরিদৃষ্ট হয়। বিশেষ করে যেসব ঘটনায় গ্রামজীবনের সহজ জীবনদর্শন ও মূল্যবোধে চিড় ধরেছে, সেসব ঘটনাও অনেক ক্ষেত্রে এই শিল্পের বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে। অভিনয় ও গীত সহযোগে মানুষের কাছে সেই বার্তা পৌঁছে দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

গবেষক : হুলি গানের কি কোনো লিখিত রূপ ছিল?

শফিক স্যার : হুলির গানের নাট্যবস্তুর কোন স্ক্রিপ্ট বা লিখিত রুপ থাকে না, এমনটাই জানি।

গবেষক : হুলির গানে ভাষার ব্যবহার?

শফিক স্যার : হুলির গানে প্রমিত ভাষার প্রচলন লক্ষ্য করা যায় না। এর সংলাপ ও গীতে আঞ্চলিক ভাষারই ব্যবহার হয়ে থাকে।

গবেষক : মঞ্চের কোনো পরিবর্তন হয়েছে কিনা?

শফিক স্যার : মঞ্চ এবং আসন বিন্যাসে বড় পরিবর্তন হয়নি। তবে গ্রামীন পরিবেশের পরিবর্তে শহরের পরিবেশে মঞ্চ ও আসন ব্যবস্থাপনায় বাস্তব কারণেই কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটে যার। চক্রাকার দর্শক আসনে মাদুরের জায়গায় ঠাঁই নেয় প্লাস্টিক চেয়ার, বৈদ্যুতিক সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে আলোক নিয়ন্ত্রণ, সাউন্ড সিস্টেম ও শব্দযন্ত্রের ব্যাবহার এসবও উল্লেখযোগ্য।

গবেষক : কস্টিউমের ক্ষেত্রে কোন পরিবর্তন হয়েছে কিনা?

শফিক স্যার : কস্টিউমের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন পরিদৃষ্ট হয় না।

গবেষক : হুলি গানের কুশিলবদের সমাজে কিভাবে দেখা হয়?

শফিক স্যার : সুদীর্ঘকাল ধরে একটি শিল্প ঐতিহ্যকে বহন করে চললেও সমাজে হুলির গানের শিল্পীরা ঠিক মূল ধারার অন্যান্য শিল্পীদের মত সমাদৃত নয়। তাদেরকে উপেক্ষিত প্রান্তজন হিসেবেই টিকে থাকার সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হচ্ছে।

গবেষক : হুলি গানের সাথে যারা দীর্ঘদিন যাবত জড়িত তাদের বর্তমান অবস্থা?

শফিক স্যার : নাগরিক সংস্কৃতির দাপটে প্রান্তজনের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য অনেক কাল ধরেই হুমকির মুখে। এটি অন্যান্য ধারার লোকশিল্পীদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। জীবিকার তাগিদে অনেক শিল্পীই অন্য পেশা বেছে নিচ্ছেন। নতুন শিল্পী তৈরি হওয়ার পথও সঙ্কুচিত হয়ে পড়ছে।

গবেষক : হুলি গানের পৃষ্ঠপোষকতা কেমন?

শফিক স্যার : পৃষ্ঠপোষকতা নামমাত্র। যে দলের একটু সুনাম আছে তারা কালেভদ্রে জেলা বা উপজেলা সদরে কোন কোন সংস্থার আমন্ত্রণে পালা করার সুযোগ পায়। সামান্য সম্মানীও হয়ত পায়। কিন্তু এই শিল্প তার স্বকীয়তা নিয়ে টিকে থাকতে পারবে, এমন কোন পৃষ্ঠপোষকতা চোখে পড়ে না।

গবেষক : ঐতিহ্যবাহী এ গানকে বাঁচিয়ে রাখতে কি করণীয়?

শফিক স্যার : সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়, শিল্পকলা একাডেমি এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ফোকলোর বিভাগকে দেশের লোকসংস্কৃতি রক্ষায় সুচিন্তিত ও সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণ করা আবশ্যক মনে করি। লোকসাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মূল্য ও গুরুত্ব সাধারণের মাঝে তুলে ধরা সম্ভব না হলে এগুলো বিলীন হয়ে যেতে পারে। আবশ্যক মনে করি। লোকসাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মূল্য ও গুরুত্ব সাধারণের মাঝে তুলে ধরা সম্ভব না হলে এগুলো বিলীন হয়ে যেতে পারে।

গবেষক : মহামূল্যবান সময় ও তথ্য প্রদান করে ধন্য ও ঋণী করলেন। স্যার, আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

শফিক স্যার : তোমাকেও ধন্যবাদ ও শুভ কামনা।

সাক্ষাৎকার ২

(শ্রী নগেন্দ্রনাথ রায়, হুলি গানের প্রবীন দর্শক ও পৃষ্ঠপোষক, বয়স ৭০, লাখেরাজ ঘুমটি, মাগুরা, পঞ্চগড় সদর, পঞ্চগড়)

গবেষক : কাকাবাবু কেমন আছেন কাকাবাবু কেমন আছেন?

শ্রী নগেন্দ্রনাথ রায়: ভালো আছি বাবা। তুমি কেমন আছো?

গবেষক : জি আপনার আশীর্বাদে ভালো। কাকাবাবু, আপনিতো হুলিগানের একজন প্রবীণ দর্শক ও পৃষ্ঠপোষক। হুলিগান সর্ম্পকে যদি একটু বলতেন?

শ্রী নগেন্দ্রনাথ রায় : আমাদের পঞ্চগড় জেলার একটা অন্যতম আদি নিদর্শন এবং একই সাথে এটা একটা জনপ্রিয় লোকনাট্য। আমাদের এদিকে ধামের গান বা পালাটিয়া নামেও উল্লেখ করা হয়। পঞ্চগড় জেলার একটি জনপ্রিয় পরিবেশনা।

গবেষক : কতদিন ধরে হুলির গান উপভোগ করে আসছেন?

শ্রী নগেন্দ্রনাথ রায় : আমার বয়স এখন ৭০ এর কাছাকাছি। সেই ছোট্টবেলা থেকেই। যখন থেকে বুঝতে শিখেছি তখন থেকেই হুলির গান দেখে আসছি।

গবেষক: আমি যতদূর জানি হুলির গান এক ধরনের মিশ্র পরিবেশনা একই সাথে লোকসংগীত এবং লোকনাট্য। কিন্তু এটাকে হুলির গান কেন বলা হয়?

শ্রী নগেন্দ্রনাথ রায় : এধরনের পরিবেশনা গানকে নির্ভর করেই পরিবেশিত হয়ে থাকে এবং পুরো পালার মধ্যে গানের পরিমাণ বেশি। গানের মাধ্যমে কোন একটি বিষয়কে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়। হুলির গানে কাহিনি বর্ণিত হয় গানের মাইধ্যমে তার জইন্য 'হুলির গান' বলে।

গবেষক : হুলির গানের আয়োজন কারা করে থাকেন?

শ্রী নগেন্দ্রনাথ রায় : গ্রামের সব মানুষ চাল, টাকা-পয়সা দিয়ে হুলির গানের দলের বায়নামা করে। আর এই অনুষ্ঠান পরিচালনার জন্য কয়েকজনকে বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হয়। আসলে গ্রামের সব খেটে খাওয়া এবং পারিবারিকভাবে সচ্ছল সবাই মিলে এই গানের আয়োজন করা হয়।

গবেষক : কোন সময়ে এই হুলির গান বেশি আয়োজন করা হয়ে থাকে?

শ্রী নগেন্দ্রনাথ রায় : ফাল্গুন মাসের শেষে এবং চৈত্র মাসের শুরুর দিকে দোল পূর্ণিমাকে কেন্দ্র করে হুলির গানের আয়োজন বেশি হয়ে থাকে। তবে বছরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পূজা-পার্বণ উপলক্ষে হুলির পালার আয়োজন করা হয়।

গবেষক : হুলিগান এর পরিবেশনের জন্য বর্তমানে যেমন স্থায়ী ধাম বা মঞ্চ তৈরি করা হয়, আগে কিভাবে মঞ্চ তৈরি করা হতো?

শ্রী নগেন্দ্রনাথ রায় : এখনকার মত এত সুন্দর করে পাকা করা স্থায়ী দাম বা মাটির উঁচু ঢিবি এমনটা করার সুযোগ কম ছিল। ওই হোলি উৎসব শুরু হলেই হুলির পালা আয়োজনের জন্য কোনোরকমে মাটি দিয়ে এক ফিট উঁচু করে দশ ফুট বাই পনের ফুট ধাম তৈরি করা হতো, ধামের চারপাশে চারটা কলা গাছ পুঁতে দেওয়া হইত। উপরে কাপড় দিয়ে ছাউনি দেওয়া হতো তবে সেটা শুধুমাত্র মূল মঞ্চের উপরে।

গবেষক : বর্তমানে পালা পরিবেশনের যে বিষয়বস্তু এবং সুরের যে ব্যবহার পূর্বের তুলনায় কোনো পরিবর্তন আসছে কিনা?

শ্রী নগেন্দ্রনাথ রায় : ছোটবেলায় যখন হুলির গান শুনতাম তখন অনেকটা ধর্মীয় বা শাস্ত্রীয় বিষয় পালার মধ্যে আসত সামাজিক বিষয় বা সামাজিক ঘটনা এগুলো বিষয়বস্তু হিসেবে খুব একটা ব্যবহার হতো না, তবে বর্তমানে হুলির গানে সমাজের নানা অসংগতি বিষয়বস্তু হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং সুরেও বেশ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

গবেষক : হুলির গানের আয়োজনে সামাজিক বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয় কিনা?

শ্রী নগেন্দ্রনাথ রায় : বিভিন্ন সময় হুলির গান আয়োজনে নানান সামাজিক সমস্যা, বাধা-বিপত্তি দেখেছি ইতিপূর্বে। তবে, সদিচ্ছা থাকলে সবাই সমাজের সবাই চাইলে সুন্দরভাবে এটার আয়োজন করা সম্ভব হয়।

গবেষক : প্রশাসনিক বা রাষ্ট্রীয়ভাবে হুলি কানের কোন অনুদান দেওয়া হয় কিনা?

শ্রী নগেন্দ্রনাথ রায় : রাষ্ট্রীয় বা প্রশাসনিকভাবে তেমন কোনো সহায়তা করে না বললেই চলে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ধন্যাঢ্য ব্যক্তিরা কিছু কিছু অনুদান প্রদান করে এই গানের আয়োজনে।

গবেষক : আপনি শিক্ষকতা এর সাথে জড়িত ছিলেন এবং এই গানের একজন অন্যতম পৃষ্ঠপোষক নিজেও অনেক পালার আয়োজন করেছেন। লোকঐতিহ্যকে টিকিয়ে রাখতে হলে করণীয় কি বলে আপনি মনে করেন?

শ্রী নগেন্দ্রনাথ রায় : হুলির গান শুধুমাত্র আমাদের পঞ্চগড় জেলার সম্পদ নয় এটা দেশের সম্পদ, দেশের ঐতিহ্য। আর এই দেশের ঐতিহ্য কি টিকিয়ে রাখতে হলে সমাজের বিত্তবান এবং রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা খুবই জরুরী।

গবেষক : আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ কাকাবাবু।

শ্রী নগেন্দ্রনাথ রায় : তোমাকেও ধন্যবাদ বাবা নিজের জেলার ঐতিহ্য নিয়ে কাজ করতেছ। দোয়া ও আশীর্বাদ করি ভবিষ্যতে আরও ভালো কাজ করবে।

সাক্ষাৎকার ৩

(সরকার হায়দার, নাট্যকর্মী, নাট্যকার, লেখক, সাংবাদিক, বয়স ৪৫, বাড়ি- তেঁতুলিয়া, পঞ্চগড়)

গবেষক : ভাই কেমন আছেন?

সরকার হায়দার : করোনার এই মহামারিতে ভালো থাকাটা খুব কষ্টকর, তবে চেষ্টা করছি ভালো থাকার জন্য।

গবেষক : আপনিতো সাংবাদিকতার পাশাপাশি নাট্য নির্দেশনা, নাটক পরিচালনা ও অভিনয়, সাহিত্য রচনাসহ সামাজিক, সাংস্কৃতিক বিষয়ের সাথে জড়িত। কেমন চলছে আপনার সবকিছু?

সরকার হায়দার : সাংবাদিকতার কাজ কাজ তো রুমে বসে করতেছি অনলাইনে, মাঝেমধ্যে বাইরে ফিল্ড ওয়ার্ক করতে হচ্ছে। আর সময় করে একটু নাটকের স্ক্রিপ্ট লেখার চেষ্টা করছি, তবে করোনার সময়কালে নাটকের নতুন প্রোডাকশন খুবই দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে। নানা রকম প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। সবকিছু মিলিয়ে কোন রকমে চলে যাচ্ছে। তবে, এ অবস্থা থেকে খুব দ্রুতই আমরা বের হয়ে আসবো বলে প্রত্যাশা করি।

গবেষক : আপনিতো দীর্ঘদিন থেকে নাটকের সাথে জড়িত, লোকনাটকে আপনার বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ এবং সফল কাজ রয়েছে। পঞ্চগড় জেলার ঐতিহ্যবাহী লোকনাট্য হুলির গান সম্পর্কে আপনার কাছে কিছু শোনার সৌভাগ্য কি হবে?

সরকার হায়দার : আরে আমি এখনো এত বড় মাপের মানুষ হই নি। আমি যতটুক জানি হুলিগান সম্পর্কে তা থেকেই বলবার চেষ্টা করছি। হুলির গান হচ্ছে, আমাদের বৃহত্তর উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, দার্জিলিং, পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, নীলফামারী, দিনাজপুর অঞ্চলের একটা লোকঐতিহ্য, লোকনাটক। এ লোকগানের আবির্ভাব বা উৎপত্তি কবে হয়েছে তা সঠিকভাবে বলা মুশকিল। তবে, এর উদ্ভব আনুমানিক ৪০০ থেকে ৫০০ বছর আগে, তখন থেকেই প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী হুলির গানের পরিবেশনা হয়ে আসছে। আসলে, ‘হুলির গান’ বলা হলেও এর মধ্যে অভিনয় আছে, আর আখ্যানধর্মী পরিবেশনা আসলে নাটক। আর হুলি নিঃসন্দেহে লোকনাট্য। সমসাময়িক ঘটনাকে উপজীব্য করে হুলি গানের পরিবেশনা হয়ে আসছে।

গবেষক : হুলির গান নিয়ে কাজ করার সুযোগ হয়েছে কিনা?

সরকার হায়দার : আমার হুলির গান নিয়ে কাজ করার সুযোগ হয়নি। তবে, আমি হুলি গানের একজন একনিষ্ঠ ভক্ত, সমাজদার দর্শক। আমি ক্লাস থ্রী-তে যখন পড়ি তখন থেকেই রাত জেগে হুলির গান দেখে আসছি। হুলির গান কে কেন্দ্র করে ওই সময় মেলা বসতো, উৎসব উৎসব একটা ভাব বিরাজ করতো। খুব ভালো লাগতো। 'হুলির গান' বা 'হুলির ধাম' গ্রামাঞ্চলে শীতকাল ও দোল পূর্ণিমার সময় বিনোদনের অন্যতম উৎস ছিল।

গবেষক : হুলির গানের বিষয়বস্তুগত কোন বৈচিত্র্য লক্ষ্য করছেন কিনা?

সরকার হায়দার : বিষয়বস্তুগত বেশ পরিবর্তন আমি লক্ষ করেছি। আমি যখন ছোট, ওই সময় আমি দেখতাম রাম-লক্ষণ, সীতা হরণ, বেহুলা-বিসর্জন পালা। কিন্তু প্রথমদিকে, ধর্মীয় বিষয়কে উপজীব্য করে হুলির গানের বিষয়বস্তু নির্বাচিত হলেও এটা খুব বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। পরবর্তীতে, সামাজিক নানা অসমতা, সামাজিক সমস্যা ও অসংগতি এসব হুলির গানের বিষয়বস্তু হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। হুলির গানের রং পাঁচালি পরিবেশনার মধ্যে 'মফিজুল ফাতরার গান' এটা হুলির একটা পালা। আগে এলাকায় যারা খুব দুষ্টামি করত, উড়নচন্ডী ছিল তাদেরকে 'ফাতরা' বলা হত। আশি-নব্বই দশকের দিকে এই 'ফাতরা' শব্দটির খুবই প্রচলন ছিল সামাজিক সমস্যা ছাড়াও এমন হাস্য রসাত্মক কিছু বিষয়ের উপরে হুলির গানে পরিবেশনা হতো।

গবেষক : মঞ্চ বা আসরের কোন পরিবর্তন দেখছেন কিনা?

সরকার হায়দার : না, মঞ্চের তেমন একটা পরিবর্তন দেখছি না। আগেও যেভাবে চারকোনা আকারে মঞ্চ থাকত এবং গোল করে মাঝখানে বাদকরা বসতো আর মঞ্চের চতুর্পাশ দিয়ে দর্শকদের অবস্থান ছিল। এখনো ঠিক তেমনি। তবে, আলোকসজ্জা ও মিউজিক্যাল ক্ষেত্রে পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। বাদ্যযন্ত্রের ক্ষেত্রে পরিবর্তন আসছে। প্রথমদিকে বাঁশি, ঢোল, হারমোনিয়াম, মন্দিরা এসকল যন্ত্র ব্যবহৃত হতো কিন্তু বর্তমানে হারমোনিয়ামের জায়গায় কিবোর্ড, প্যাডসহ আরও বেশ কিছু আধুনিক বাদ্যযন্ত্র অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

গবেষক : মঞ্চে সাজসজ্জা ও আলোকসজ্জায় পরিবর্তন হয়েছে কি?

সরকার হায়দার : মঞ্চের উপরে এখন যেমন সামিয়ানা দেওয়া হয় পূর্বে কিন্তু তেমনটা ছিল না। আগে আমরা ছোটবেলায় দেখতাম, মঞ্চের ঠিক উপরে পুরাতন শাড়ি বা বিছানার চাদর কিংবা পাট খড়ি যেটা আমাদের এলাকায় বলে সিংজা, সেটার বেড়া মঞ্চের ছাউনি হিসেবে দেওয়া হতো।

গবেষক : হুলি পরিবেশনার গেট এর ব্যবহার আছে কি?

সরকার হায়দার : মূলত, হুলির গানে বা পালাটিয়া বা ধামের গানে সাজগৃহে যাওয়ার কোন অ্যাপিয়ার গেট থাকেনা বলেই জানতাম। কুশিলবগণ মঞ্চের মাঝখানে বাদকদের পাশে বসে যান এবং চরিত্র অনুযায়ী দাঁড়িয়ে উপস্থিত পরিবেশনা করে থাকেন। একজন অভিনেতা একাধিক চরিত্রে অভিনয় করে থাকেন।

গবেষক : হুলির গানে ছুকরি বা ছোকরা চরিত্র সম্পর্কে যদি বলতেন।

সরকার হায়দার : হুলিগান এর অন্যতম দিক হচ্ছে এই গানে অভিনয়, সংলাপ ও গানের পাশাপাশি নৃত্যের সংযোজন। ছুকরিরা সাধারণত নৃত্যকরে। ছেলেরা যখন মেয়ে সাজে তখন বলা হয় ছুকরি আর ছেলেদের কে বলা হয় ছোকরা। তবে এখনো পর্যন্ত হুলি গানের পরিবেশনায় মেয়েদের অংশগ্রহণ দেখা যায়নি বললেই চলে। সাধারণত, ছেলেরাই মেয়ে সাজে, বউ বা মেয়ে বা নারী চরিত্রে পুরুষেরাই অভিনয় করে থাকেন।

গবেষক : হুলির গানের সুরের বৈচিত্র্য কোন পরিবর্তন হয়েছে কিনা?

সরকার হায়দার : শরীর তেতে পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে আগে পরিবেশনায় ভাওয়াইয়ার একটা টিউন, মৌলিক একটা টিউন পাওয়া যেত। এই এলাকার মানুষের জীবন যাপন অত্যন্ত সহজ সরল। আর সহজ সরল জীবনযাপন এর সাথে হুলি গানের সুরের আত্মিক সম্পর্ক ছিল।

গবেষক : হুলি গানের সাথে যারা জড়িত, তাদেরকে সমাজে কোন দৃষ্টিতে দেখা হয়?

সরকার হায়দার : প্রতিমুহূর্তে তারা অবহেলা-বঞ্চনার শিকার হচ্ছেন। সারারাত ধরে হুলি গানের পরিবেশনা দেখার পরেও সকালবেলায় তাদের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করেন সমাজের মানুষ। এদের পিছনে তেমন কোন ব্যাকআপ নেই বললেই চলে, কোন পৃষ্ঠপোষকতা নেই, সমাজের বিত্তবান লোকজন এদের দায়ভার কখনো নিতে চান না।

গবেষক : হুলির গানের সুরের প্রভাব আছে কিনা?

সরকার হায়দার : আমাদের পঞ্চগড়ের অন্যান্য যে পালাগুলো আছে বা পরিবেশনা গুলো আছে যেমন- সত্যপীরের গানের ২/৩ টি পরিবেশনা সেখানেও দেখেছি একেকটি পরিবেশনায় একেকরকম সুরের ব্যবহার। হুলি গানের ক্ষেত্রেও ঠিক তেমনটাই। আমার দেখা সর্বশেষ হুলি গান 'প্যাঁচকেটার পালা'। সেই পালাতেও বেশ কয়েকটি সুরের গান পরিবেশিত হয়েছিল।

গবেষক : হুলি গানের পৃষ্ঠপোষকতা করা হয় কিনা?

সরকার হায়দার : আমার জানা মতে, হুলি গানের কোন পৃষ্ঠপোষকতা করা হয় না, পূর্বে করা হতো কিনা জানিনা। তবে বর্তমানে কোন পৃষ্ঠপোষকতা নেই, এমনকি হুলি গানের যারা কুশিলব আছেন তাদেরকে করোনায় কোন আর্থিক প্রণোদনা দেওয়া হয় নাই। স্থানীয় প্রশাসন ও রাষ্ট্রের কোন সুনজর হুলি গানের কুশিলবদের প্রতি নেই।

গবেষক : হুলি গানের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে করণীয় কি বলে মনে করেন?

সরকার হায়দার : আমাদের ঐতিহ্যবাহী লোকনাট্য হুলি গানকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে পৃষ্ঠপোষকতার পাশাপাশি হুলি গানের কুশিলবদের তালিকা প্রণয়ন এবং তাদেরকে উন্নত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, হুলি গান পরিবেশনায় আধুনিকায়ন করা এবং টিকিট কেটে যেন হুলিগান দেখে সেই পরিবেশ তৈরি করা। এসব করতে পারলে হুলি গান যুগ যুগ ধরে বেঁচে থাকবে।

গবেষক : আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ হায়দার ভাই। ভালো থাকবেন, দোয়া রাখবেন।

সরকার হায়দার : তোমাকেও অনেক ধন্যবাদ রবি। পঞ্চগড়ের লোক ঐতিহ্য নিয়ে কাজ করছ বলে আমি গর্ববোধ করছি। শুভ কামনা এবং সেইসাথে আবারো চা পানের নিমন্ত্রণ রইল।

সাক্ষাৎকার-৪

(শ্রী বাসুদেব রায়, পেশাঃ অভিনয়, হুলি গানের সরকার, যাত্রা গানের সরকার, বাউল শিল্পী, অবসরপ্রাপ্ত সরকারি চাকুরিজীবী, বয়স ৭০, সুন্দরদিঘী, দেবিগঞ্জ, পঞ্চগড়)

গবেষক : কাকাবাবু নমস্কার। আপনার শরীর ভালো? করোনা কালে সমস্যা হচ্ছে না তো?

বাসুদেব রায় : জী, নমস্কার বাবু। আছে শরীর ভালো আছে। সুস্থ আছি এটাই ভগবানের কৃপা। আর করোনাকালে তো সমস্যা একটু হচ্ছেই। আমার এই ৭০ বছর বয়সে অনেক মহামারী দেখেছি, কিন্তু এমন এত বড় এবং সারা পৃথিবীতে মহামারী আঘাত হানে এমন মহামারী দেখিনি।

গবেষক : কতদিন যাবৎ আপনি অভিনয়ের সাথে জড়িত?

বাসুদেব রায় : দশ বারো বছর বয়স থেকেই যাত্রা গানে শিশু চরিত্রে অভিনয় ও অন্যান্য নাটকে অভিনয়। তা প্রায় পঞ্চাশ-ষাট বছর তো হবেই। বিভিন্ন অপেরায় কাজ করেছি ম্যানেজার হিসেবে, পরিচালক হিসেবে।

গবেষক : কোন কোন অপেরায় কাজ করেছেন?

বাসুদেব রায় : শিউলি অপেরা, গীতাঞ্জলি অপেরা, শতরূপা অপেরা।

গবেষক : আপনার পরিবারের অন্য কেউ এ পেশার সাথে জড়িত?

বাসুদেব রায় : আমার বড় ছেলে, মেজো ছেলে, আমার ভাতিজা তারা এই যাত্রা, হুলি অপেরার সাথে জড়িত।

গবেষক : অভিনয় ছাড়া অন্য কোন পেশার সাথে জড়িত?

বাসুদেব রায় : আমি পরিবার পরিকল্পনার একজন স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করা চাকুরীজীবী। যাত্রা গান, হুলি গান, সামাজিক নাটক এসবের পৃষ্ঠপোষকতা ও পরিচালনা করতে গিয়ে আমি চাকরি তিন বছর থাকাকালীন সময়ে স্বেচ্ছায় অবসরে যাই।

গবেষক : হুলি গানে অভিনয় করেছেন। হুলি গান কোন সময় বেশি আয়োজন করা হয়ে থাকে?

বাসুদেব রায় : আশ্বিন কার্তিক মাস বিশেষ করে দোল পূর্ণিমা উপলক্ষে হুলি গানের আয়োজন করা হয়। পূর্ণিমার দিন ঠাকুরের বিয়ে দেওয়া হয়। পরেরদিন ঠাকুরকে নিয়ে বাড়ি বাড়ি ঘুরে চাল-ডাল, মরিচ, আদা এসব সংগ্রহ করা

হয়ে থাকে। হারমোনিয়াম, খোল, মন্দিরা, জুড়ি, আড় বাঁশি এসব বাদ্যযন্ত্র সহযোগে ঘুরে ঘুরে পুরো গ্রামে মনশিক্ষা গান পরিবেশন করা হয় যাকে শোয়ারি বলে। পরের দিন স্থায়ী বা অস্থায়ী ধামে হুলি গান পরিবেশিত হয়।

গবেষক : মঞ্চ বা আসরের অবস্থান সম্পর্কে যদি বলতেন?

বাসুদেব রায় : মন্দিরের মাঠ, খোলা মাঠ, গ্রামের হাট, বাড়ির বাইরের আঙ্গিনা যেটাকে বলে বাহির বাড়ি ইত্যাদি জায়গায় স্থায়ী বা অস্থায়ী মঞ্চ তৈরি করে হুলির গানের পরিবেশন হয়। চারকোনা আকৃতির ১ ফুট উঁচু মাটির ঢিবি তৈরি করা হয়, আর এর চারকোণে পূর্বে চারটি কলাগাছ গর্ত খুঁড়ে পুঁতে রাখা হতো এবং কলা গাছ গুলো সুতা দিয়ে চতুর্পাশে বাধা থাকতো। ডিবি বা মঞ্চের উপরে পাট খড়ির চালা অথবা কাপড়ের ছাউনি দেওয়া থাকতো।

গবেষক : হুলি গানের বিষয়বস্তুতে বর্তমানে কোন পরিবর্তন দেখছেন কিনা?

বাসুদেব রায় : হুলি গান তো প্রথমদিকে ছিল দেবস্তুতিমূলক। পালাগুলো ছিল- রাধার মান ভঞ্জন, মথুরায় উন্মাদিনী, নৌকা বিলাস, নিমাই সন্ন্যাস ইত্যাদি ইত্যাদি। পরে অবশ্য বিসয়বস্তুর অনেক পরিবর্তন হয়েছে। সামাজিক যে সমস্যাগুলো আমাদের সমাজে নিত্যদিনের সেগুলো হুলি গানের পরিবেশনার মধ্যে ফুটে উঠছে। রং পাঁচালি, মান পাঁচালী, ঝুমুর যাত্রা, দেহতত্ত্ব বা মনোশিক্ষা এই চার রকমের হুলি গানের পরিবেশনা দেখে আসছি।

গবেষক : রং পাঁচালি বা মান পাঁচালীতে আপনার অভিনয় করা সবচেয়ে পছন্দের পালার নাম?

বাসুদেব রায় : রং পাঁচালি হিসেবে আমার অভিনয় করে ভালো লাগছে 'পাস করা ডাঙ্গুয়া' পালা এবং মান পাঁচালী হিসেবে 'সতী নারীর হেবেলা দপ্তরী' পালা।

গবেষক : হুলি গানের পরিবেশনারীতি নিয়ে যদি বলতেন?

বাসুদেব রায় : হুলি গান একক বা যৌথভাবে পরিবেশিত হয়। ১৭ থেকে ১৮ জন কোন কোন ক্ষেত্রে ৮ থেকে ১০ জন কুশীলব বা অভিনেতা থাকেন, একজন ম্যানেজার থাকেন, একজন দলপতি থাকেন, ঢুলি থাকেন, কর্নেট বাদক থাকেন, ফ্লুয়েট বাদক থাকেন, আড় বাঁশি বাদক থাকেন, হারমোনিয়াম বাদক থাকেন।

গবেষক : পোশাকের ব্যবহার কেমন?

বাসুদেব রায় : চরিত্র অনুযায়ী পোশাকের ব্যবহার হয়ে থাকে। তবে পূর্বে পোশাকের ক্ষেত্রে গেঞ্জি, লুঙ্গি, ঘাড়ের গামছা এসব গ্রামীণ পোশাকেই হুলির গান পরিবেশিত হত। বর্তমানে পোশাকের ক্ষেত্রে বেশ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

গবেষক : ম্যাকাপ এর ব্যবহার?

বাসুদেব রায় : মেকআপ হিসেবে পূর্বে মিনা লাল কালারের, জিংক অক্সাইড, ভুসা সিন্দুর, দাড়ির ক্র্যাপ, নকল চুল, শাল, চাদর, ধুতি, কালো রং দিযে দাঁত কালারের ব্যবস্থা এসবই ছিল মেকআপ এর উপকরণ।

গবেষক : হুলি গান এ কোন কোন পেশার মানুষ অভিনয় করে থাকেন?

বাসুদেব রায় : হুলি গান এ শিক্ষকতা পেশার, ছাত্র, দিনমজুর, টেইলার্স পেশা, চায়ের দোকানদার, পানের দোকানদার, কৃষক শ্রেণীর লোকের মিশ্রিত পরিবেশনা।

গবেষক : হুলি গানের পৃষ্ঠপোষকতা আছে কি?

বাসুদেব রায় : হুলি গানের শিল্পী ও কুশিলবদের প্রতি স্থানীয় প্রশাসনের কোন পৃষ্ঠপোষকতা নাই, এমনকি এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিরা তেমনভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করেন না বললেই চলে। পৃষ্ঠপোষকতার অভাবের কারণেই আমি আমার বেশ কিছু আবাদি জমি বিক্রি করে দল পরিচালনা করেছি, নিজে অর্থ খরচ করে হুলির গান, সামাজিক যাত্রা এসবের আয়োজন করেছি।

গবেষক : করোনাকালে একজন নাট্যকর্মী বা অভিনয়শিল্পী হিসেবে কোন প্রণোদনা পেয়েছেন কিনা?

বাসুদেব রায় : একজন অভিনয়শিল্পী বা নাট্যকার হিসেবে, যাত্রা শিল্পী হিসেবে কোন ধরনের প্রণোদনা পাই নাই। আমার এই অঞ্চলে, এই দেবিগঞ্জ অঞ্চলে কোন নাট্যকর্মী প্রণোদনা পায় নাই। আমি অভিনয়ের পাশাপাশি দীর্ঘদিন থেকে বাউল গানের সাথে জড়িত। একজন বাউল শিল্পী হিসেবে পঞ্চগড় শিল্পকলায় নাম অন্তর্ভুক্ত করার কারণে আমি এককালীন একবার প্রণোদনা পেয়েছিলাম। এটা একজন যাত্রা শিল্পী ও অভিনয় শিল্পী বা নাট্যকারের জন্য খুবই কষ্টকর, খুব বেদনাদায়ক।

গবেষক : পঞ্চগড় জেলার ঐতিহ্যবাহী লোকনাট্য হুলি গান কে বাঁচিয়ে রাখতে হলে কি করনীয় বলে আপনি মনে করেন?

বাসুদেব রায় : হুলি গানের অভিনয় শিল্পী, যাত্রা গানের শিল্পী, নাট্যকর্মী হিসেবে যারা রয়েছে তাদের তালিকাকরণ করা উচিত এবং তাদের একটা ভাতার ব্যবস্থা করা উচিত। প্রতি মাসে তারা নির্দিষ্ট পরিমাণ একটা ভাতা পাবে, যাতে আমাদের এই লোক ঐতিহ্যগুলো হারিয়ে না যায়। তাদেরকে আরো বেশি চর্চার জন্য ভালো পরিবেশ তৈরি করতে হবে, তাদের ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করতে হবে, সরকার বা স্থানীয় প্রশাসনের পৃষ্ঠপোষকতায় বেশি বেশি অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হবে। তাহলে আমাদের এই ঐতিহ্যবাহী পরিবেশনা বেঁচে থাকবে।

গবেষক : আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, কাকাবাবু। ভাল থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।

বাসুদেব রায় : তোমাকেও ধন্যবাদ বাবা। ভালো থাকবে, আর নিজের জেলার লোকসংস্কৃতি নিয়ে বেশি বেশি কাজ করবে এই আশীর্বাদ।

সাক্ষাৎকার ৫

(হুলি গানের প্রবীণ শিল্পী পোহাতু বর্মন, বয়স- ৬৫, পেশা- কৃষি এবং অভিনয়, লাখেরাজ ঘুমটি, মাগুরা, পঞ্চগড় সদর, পঞ্চগড়)

গবেষক : কাকা আদাব। কেনং আছেন?

পোহাতু বর্মন : বাবু আদাব। ভালো আছু বাপ।

গবেষক : কাকা, তোমরা তো অনেকদিন থেকে হুলিগান, ঝুমুর যাত্রা এগুলা করে আসেছেন। হুলিগান সম্পর্কে মোর ত কিছু জানার আছে?

পোহাতু বর্মন : কি জানি বা চাহাছি কহে ফেলা বাবু?

গবেষক : হুলি গান টা কি?

পোহাতু বর্মন : হুলি গান হছে হামার পঞ্চগড়ের হোলির উৎসবের সময় এক ধরনের পালা, লোকনাটকও কহে, কাহ আারো হুলির ধাম কহে, কাহো কহে পালাটিয়া।

গবেষক : তোমরা কতদিন যাবৎ হুলিগান করেছেন, আর কোন চরিত্রে মানে কোন পাট লে তোমরা অভিনয় করেন?

পোহাতু বর্মন : মুই ত বাবু জেলা তুকা বুঝি বা শিকিছু শেলাতে (তখন থেকে) হুলি গান দেখেছু, দশ বারো বছর বয়স থেকে পাট করেছু।

গবেষক : যেইগুলা পালাত অভিনয় করিছেন এর মধ্যে দুই একটা নাম কহিবেন?

পোহাতু বর্মন : ভেল্লা পালাত অভিনয় করিছু। পেচ কেটার সংসার, বিশ্ব হাদাং কালী, মুড়ি-বেচি, ভাকা বেচি আরও বেশ কিছু রং পাঁচালি বা খাস পাঁচালী পালাত্ বেটি ছাওয়া (নারী) চরিত্রে অভিনয় করিছু।

গবেষক : আপনার পরিবারের আর কেউ হুলির সাথে জড়িত আছে?

পোহাতু বর্মন : আমার সহধর্মিণী গত হইছে বেশ আগত। তিনজন ছুয়াপুতা ধরে আমার অভাবের সংসার। আর কাহ অভিনয় পেশাত জড়িত নাই।

গবেষক : মঞ্চের কোন পরিবর্তন দেখেছেন বর্তমানে?

পোহাতু বর্মন : মেলা পরিবর্তন। আগত হামরা মাটি লম্বয় ১২ হাত আর খাটোয় ১০ হাত চওড়া ১ ফুট উচা মাটির ঢিবি করে ধাম মঞ্চ বেনাই, তারপর চাইর কনাত (কোণে) চাইর টা কেলাগাছ পুঁতে সুতা বা পাটের আঁশ দে হেনে সুতুলির টানা দিছি। ধামের উপর পুন্না খারী (পুরাতন শাড়ি) বা লুঙ্গি দে হেনে পাটাতন না হইলে শিংযার বেড়া (পাটখড়ির চাটি) দে ছাউনী দিছি। কয়েক বছর পর বাঁশের চাটি, আরো কয় বছর পর টিনের ছাউনী দিবার রীতি চলে আসিছে। এলা তো মঞ্চ ঝকমক ঝকমক করেছে। ডেকরেটর তে ছামিয়ানা, চিয়ার, লাইটিং ভাড়া পাইল যাছে।

গবেষক : এলা (এখন) কি হুলি গানের সুর আলাদা মনে হছে নাকি আগিলা সুরে আছে?

পোহাতু বর্মন : আগিলকার (পূর্বের) দিনে সুর লা খুব মিষ্টি লাগিছে, বর্তমানে সুর এত টানা সুর নাহায়। ভাইয়াইয়া গানের ভিতর অন্য গানের সুরও এলা কনেক করে ঢুকিছে। সহজ সরল মন কারা সুরটা এলা হুলি গানত পাওয়া যায়না।

গবেষক : পালার বিষয় বা যেইডা বিষয় লে (নিয়ে) হুলি হছে ওইলা কি আগত এনোং সামাজিক কাহিনীর আছিল?

পোহাতু বর্মন : হুলি গান তো হামার হিন্দু ধর্মের ভগবান শ্রী কৃষ্ণ আর শ্রী রাধার কাহিনী লে মানে ভগবান কেন্দ্রিক গুণকীর্তন বা ধর্মীয় কাহিনী আছিল মূল বিষয়, পরে আস্তে আস্তে হামার গ্রাম অঞ্চলের দুঃখ কষ্ট, আনন্দ-বেদনা, হিংসা-বিদ্বেষ কাহিনীর বিষয় হিসাবে অসিছে। আর এইডা হামার খালি হিন্দু সম্প্রদায়ের নাহায়, তামান (সকল) লোকজন এইডা রাতি জাগে হেনে দেখে। লোকনাটক কহি আর ধামের গান কহি আর পালাটিয়া কহি হুলির গান পচাগড়ের ঐতিহ্য, সম্পদ, পাশাপাশি দেশের অমূইল্য সম্পদ।

গবেষক : পোশাকের কোন পরিবর্তন দেখেছেন?

পোহাতু বর্মন : পোশাকের কিছু ত পরিবর্তন আসিছে। আগত লুঙ্গি, গামছা, শাড়ি, ব্লাউস, পেডিকোট, সেন্ডেল গেঞ্জি (স্যান্ডো গেঞ্জি) পিন্ধে (পরিধান করে) হুলি গানের বিভিন্ন পাট (চরিত্রে অভিনয়) করে। এলা ত যায় যেইখান পাট লে অভিনয় করিবে ওই পোশাকে পিন্ধিবা লাগিবে। দাত কালা, মুখ কালা করিবার তানে আগত (পূর্বে) ভাতের পাতিলের (ভাতের পাত্র) কালি ব্যাবহার করিছি। এলা ত সব এডিমেট (রেডিমেট) পাইল (পাওয়া) যাছে।

গবেষক : হুলি গানত যে বাইদ্য যন্ত্র বাজিছে, এলা কি খালি অইলা যন্ত্র বাজেছে নাকি নয়া (নয়া) কিছু যন্ত্র ঢুকিছে?

পোহাতু বর্মন : হামরা ছোট কালে যেইসময় হুলি দেখিছি, সেলা (তখন) এতো বাইদ্যযন্ত্র ছিল্ নি। খালি হারমোনিয়াম, বাঁশি, খোল আর মন্দিরা দে (দিয়ে) হুলি গান হইছে। তারপর আস্তে আস্তে কর্নেট, ক্লারিনেট, ক্যাসিও, কি বোর্ড ছাড়াও মেলা নয়া বাইদ্যযন্ত্র যুক্ত হইছে। তোমরা বাবু আর যাই কহেন (বলেন), আগের যন্ত্র দে গান শুনিতে বেশি মজা আছিল্। এলা ত বাইদ্য যন্ত্রের শব্দে কথয় ভালো করে বুঝা যায় না। আর হুলি গানত ত মাইক্রোফোন লাগে না। খালি গলায় গান- পালা করিবে আর খুলা (খোলা) কানত্ শুনিবা হবে।

গবেষক : হুলি গানের কি কোন স্ক্রিপ্ট বা বই আছে?

পোহাতু বর্মন : হুলি গানের কোন কাহিনী লেখা রহেনা। খালি বিষয়ডা ঠিক রাখে গানের সরকার অন্য শিল্পী গুলাক লে হেনে পালার একদিন দুইদিন আগত কণেক প্রেকটিস করিলে করিল না করিলে নাই। ডায়ালগ যদি ফম (স্মরণ) না রহে তাহলে কোনো সমস্যা নাই, ওর পাট (চরিত্র) অনুযায়ী কথা বা ডায়ালগ বেনায় (তৈরি করা) লিবে।

গবেষক : হুলি গানের ভাষা কি স্ট্যান্ডার্ড ভাষা মানে প্রমিত বা শুদ্ধ উচ্চারণ করার ভাষা নাকি আঞ্চলিক মানে হামার (আমাদের) গাঁও-গেরামের ভাষা?

পোহাতু বর্মন : হুলি গানের ভাষা হামার পচাগরের (পঞ্চগড়) আঞ্চলিক ভাষা। মঞ্চত উঠে হামার অভিনয় শিল্পী লা বেশিরভাগ সময় অভিনয় চলাকালে (তাৎক্ষণিকভাবে) সংলাপ তৈরি করে। হুলি গানের কোন সংলাপ মাস্টার লাগে না। সংলাপের কুনহ লিখিত দলিল থাকে না। মুখে মুখে রচনা করা হয়।

গবেষক : মঞ্চে আলোর ব্যবস্থা কি এনং (এমন) ছিল্ মানে বর্তমানে হামরা যেমন আলোকসজ্জা দেখেছি?

পোহাতু বর্মন : এলা যেনোং আলো দেখা যাছে আগত দেখা যায়নি। আগত হারিকেন, হ্যাজাগ বাতি, পোয়াল বা খেড়ের (খড়) আগুন দে মশাল জ্বালানী এইসব করে আলোর ব্যবস্থা করা হইছে। বর্তমানে আলোর ঝকমকানিতে চাহে (তাকিয়ে) রহা (থাকা) যায় না। আগত মূল মঞ্চের অভিনয় শিল্পিগিলা দেখা গেছে আর বর্তমানে মূল স্টেজের চাহিতে বাহিরের মানে দর্শকের সারির আলোয় বেশি মনে হয় মাঝে মইধ্যে।

গবেষক : কাকা, হুলি গানের লগত (সাথে) যায় আছে উমহাক (তাদেরকে) এলাকার লোকজন কোন চোখুত্ দেখে?

পোহাতু বর্মন : একলার লোকজন কাহ্ ভালো চখুত দেখে আর কাহ দেখে মন্দ ভাবে। সমাজের কিছু লোক দেখা হইলে কহে, 'ওই ত যাচ্ছে গাউনিয়া, ওই ত যাছে ফাতেরা, এনোং নানান মইন্তব্য করেছে। হামরা শিক্ষিত লোকলা যদি হামার নিজের ঐতিহ্যের কদর করিবা না পারি, অশিক্ষিত লোকজন আর কত করিবে। হুলি গান যে

হামার নাহায় খালি এইডা পুরা দেশের ঐতিহ্য এই কথাখান বুঝিবা লাগিবে, সবাকে বুঝাবা লাগিবে নাহিলে হুলি গান আস্তে আস্তে একসময় হেরায় যাবে।

গবেষক : হুলি গানের আয়োজনে এলাকার ধনী মানসিলা টাকা পয়সা দেছে ত মানে পৃষ্ঠপোকতা আছে তো? হুলি গানের প্লিয়ার লা (শিল্পীরা) সম্মান ও সম্মানী পাছেন ত ঠিকমত?

পোহাতু বর্মন : হুলি গানের আয়োজনের সময় এলাকার চেয়ারম্যান কিছু দেয়, আর দুই একজন মুরুব্বী। বাকি সব টাকা-পাইসা গ্রামের আর হাটের লোকজনের ঠে কিছু কিছু করে চাঁদা উঠাবা লাগে। জেলা প্রশাসন, সরকার, জেলা শিল্পকলা একাডেমি এই বিষয়ে কোন নজর দেয়না। অভাবের কারণে এলা অনেক শিল্পী আর অভিনয় করিবা চাহে না, কৃষি কাজ করেছে কাহ, আর কাহ নিজের জমিত না রহিলে পরের জমিত দিনমজুর হিসাবে কাজ করেছে। হুলি গানের প্রতি এলাকার গণ্যমান্য লোক, সরকারের সুনজর না রহিলে হুলি গানের অস্তিত্ব কয়েকবছর পর আর পাওয়াইল যাবে নি।

গবেষক : করোনাকালে কোন অনুদান পাইছেন তোমরা হুলি গানের শিল্পীগিলা যায় যায় আছেন?

পোহাতু বর্মন : করোনা কালে হামাক কোনো অনুদান অভিনয় শিল্পী হিসেবে দেওয়া হয়নি বাবু। হামার যদি হুলি গানের শিল্পী হিসেবে একটা ভাতা ব্যবস্থা করা যায় ওই বিষয়ডা একটু দেখিস ত বাবু। হামরা কত কষ্ট করে দিন কাটাছি হামাক দেখার কাহ (কেউ) নাই।

গবেষক : কাকা, ভালো লাইগছে। মোক তুমরা ঋণী করিলেন। ভালো রহিবেন (থাকবেন), সুস্থ রহিবেন (থাকবেন) প্রার্থনা করেছি।

পোহাতু বর্মন : তুই অ ভালো রহিস বাবু। হামার গেরামের জিনিস লে গবেষণা করেছিস ভালো, খুব ভালো। আশীর্বাদ করেছু আরো ভালো কিছু করিবো।

আলোকচিত্র-২৯ : অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, প্রাবন্ধিক ও সংগঠক সফিকুল ইসলাম স্যারের সাথে গবেষক, ৮/৯/২০২১

আলোকচিত্র- ৩০ : হুলি গানের প্রবীণ দর্শক ও পৃষ্ঠপোষক শ্রী নগেন্দ্রনাথ রায়ের সাথে গবেষক, ৩/৯/২০২১

আলোকচিত্র- ৩১ : সাংবাদিক ও নাট্যকার সরকার হায়দারের সাথে গবেষক, ২/৯/২০২১

Rosela
rupatadine
বিধান
Dual acting
antihistamine
2021
2021/8/31 15:23

আলোকচিত্র- ৩২ : হুলি গানের প্রবীণ অভিনেতা, সরকার ও পৃষ্ঠপোষক শ্রী বাসুদেব রায়ের সাথে গবেষক, ৩১/৮/২০২১

আলোকচিত্র- ৩৩ : হুলি গানের প্রবীণ কুশিলব পোহাতু বর্মনের সাথে গবেষক, ৩/৯/২০২১

আলোকচিত্র- ৩৪ : হুলি গান ও যাত্রা অভিনেতা রাজেশ্বর বর্মনের সাথে গবেষক (উৎকুরা, বোদা, পঞ্চগড়), ৪/৯/২০২১

আলোকচিত্র- ৩৫ : প্রবীণ নাট্যকর্মী ও ম্যাকাপম্যান শহিদুল ইসলামের সাথে গবেষক (রওশনাবাগ, পঞ্চগড়), ৫/৯/২০২১

2019-3-24 08:40

আলোকচিত্র- ৩৬ : হুলি গানের সরকার ও কুশিলব সামন্ত বাবু ও গবেষক (লাখেরাজ ঘুমটি, পঞ্চগড়), ২৪/৩/২০১৯

আলোকচিত্র- ৩৭ : হুলি গান ও যাত্রা অভিনেতা প্রশন্ন কুমার রায় ও গবেষক (উৎকুরা, বোদা, পঞ্চগড়), ৪/৯/২১

আলোকচিত্র- ৩৮ : হুলি গানের কুশিলব জয়ন্ত রায়ের সাথে গবেষক (লাখেরাজ ঘুমটি, পঞ্চগড়), ৬/৯/২০২১

আলোকচিত্র- ৩৯ : হুলি গান ও যাত্রা অভিনেতা হরেন্দ্রনাথ রায় ও গবেষক (উৎকুরা, বোদা, পঞ্চগড়), ৪/৯/২১

আলোকচিত্র- ৪০ : হুলি গান ও যাত্রা গানের কুশিলব সুনীল চন্দ্র ও গবেষক (উৎকুরা, বোদা, পঞ্চগড়), ৪/৯/২১

উপসংহার

বাঙালির হাজার বছরের ঐতিহ্য বাংলা লোকনাট্য। এসব নাটক আমাদের চিন্তার খোরাক যোগায়, শাণিত করে মানবিক চেতনাকে। তাই সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে যতটুকু অসমতা রয়েছে, তা দূরীকরণে প্রয়োজন বেশি করে নাট্যচর্চা এবং শান্তি ও পারস্পরিক সম্প্রীতির যে আদর্শকে বাঙালি সংস্কৃতি ধারণ করে আছে, জীবনের প্রতিক্ষেত্রে তা অনুসরণ করা বর্তমানে অতি জরুরী হয়ে দাঁড়িয়েছে। পঞ্চগড় জেলার 'হুলি' গানের উদ্ভব মূলত হিন্দুধর্মের উৎসবকে কেন্দ্র করে। কাজেই এদেশের ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারার শ্রেণীকরণে ধর্মনির্ভর নাট্যের প্রসঙ্গ বেশ বিস্তৃতভাবে আসে। ধর্মীয় উৎসবকে কেন্দ্র করে হুলি গানের উদ্ভব ঘটলেও তা ঐতিহ্যবাহী পরিবেশনার মাধ্যমে সর্বজনীন রূপ লাভ করে। ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারায় পঞ্চগড় জেলার হুলি গান হয়ে ওঠে একই সাথে জনপ্রিয় ও লোকনাট্যরূপে। জনপ্রিয় এই মিশ্র পরিবেশনায় সমসাময়িক বিষয় উপজীব্য হবার দরুণ এতে গ্রামীণ সমাজের শাশ্বত রূপ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ফুটে ওঠে। এ জেলার লোকঐতিহ্য তথা লোকসাহিত্যের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ উপাদানের মধ্যে লোকনাট্য একটি বিশেষ ও অনবদ্য ধারা হিসেবে জনমনে বিশেষ স্থান করে নিতে সক্ষম হয়েছে। এ অঞ্চলের অন্যান্য লোকনাট্যের মধ্যে 'সত্যপীরের গান' এর উদ্ভবও কিন্তু ধর্মকেন্দ্রিক। ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, প্রতিটি ঐতিহ্যবাহী লোকনাট্যের বিষয়বস্তু প্রথমদিকে ধর্মকে কেন্দ্র করে উদ্ভব ঘটলেও সমাজের চিরায়ত যে রূপ ও সমাজের মানুষের প্রাত্যহিক জীবনপ্রণালী তার মূল বিষয়বস্তু হিসেবে কোন না কোনভাবে অন্তর্ভুক্ত হয়। তবে একটি পরিবেশনা যখন সমাজের মানুষের সামগ্রিক চিত্র তথা সমাজ বাস্তবতার অন্তর্নিহিত ভাব ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়, তখন তা ধর্ম-কুল-সম্প্রদায়ের ঊর্ধ্বে বিচরণের মধ্যদিয়ে হয়ে ওঠে একটি অঞ্চলের ঐতিহ্য। আর সেই সাথে দেশের সাংস্কৃতিক ভাণ্ডারে পূর্ণতা দানকারী অমূল্য সম্পদ। তবে, বৃহত্তর ধর্ম মুসলমান-হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান এ সকলের অন্তরালেও এদেশের মানুষের একটি নিজস্ব ধর্মবোধ আছে; সেই সূত্রে এর ভেতর দিয়ে এদেশের মানুষ এক অসাম্প্রদায়িক চেতনায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। তাই যেকোন ধর্মকেন্দ্রিক পরিবেশনাই হোক না কেন তা এখানকার জলবায়ুতেই পুষ্টিলাভ করে এদেশের মানুষের জাতীয় রসচেতনার সঙ্গে খুব সহজেই আত্মিক মেলবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে। সম্ভবত, এ কারণেই দেখা যায়, কোন একটি ধর্মমত নির্ভর পরিবেশনা অন্য ধর্মমতের মানুষ কর্তৃক

অবলীলায় অভিনীত হয়ে থাকে। আর তাই এদেশের জাতীয় রসচেতনার পরিচয়বাহী ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারার সম্পূর্ণরুপে বিলুপ্তি হবার কথা নয়। কারণ, যেভাবেই হোক দীর্ঘদিন ধরে সমাজ ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারার একটি নিজস্ব রূপ সবসময় রক্ষা করে চলে; নাগরিক জীবনে তা নানাভাবে বিপর্যস্ত হলেও গ্রামীণ জীবনের সমাদরে টিকে থাকে যগ যগান্তরে। সুতরাং, এর প্রাণশক্তি যত ক্ষীণই হোক না কেন, তা বিনাশ হতে পাওে না। আর তাই, হুলি গান তার আবেদন একটি অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে হয়ে ওঠে সর্বজনীন। পঞ্চগড় জেলার হুলি গান শুধুমাত্র এ জেলার প্রতিচ্ছবিই ফুটিয়ে তোলে তা নয়, বরং তা সারা বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ খেটে খাওয়া গ্রামীণ জনজীবনের প্রতিচ্ছবি ফুটিয়ে তোলে, এ কথা অনস্বীকার্য। এদিক বিবেচনায়, পঞ্চগড় জেলার জনপ্রিয় ও ঐতিহ্যবাহী মিশ্র পরিবেশনা 'হুলি গান' এ জেলার লোকসংস্কৃতির ভাণ্ডারকে পূর্ণতা দানের পাশাপাশি বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতির ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে তা অস্বীকার করার কোন অবকাশ নেই। আত্মশক্তির অদম্য ও দুর্বার গতিধারাই বহন কওে চলেছে বাংলার লোকজ সংস্কৃতিকে সহস্র বছর ধরে। এ সংস্কৃতির প্রবাহমানতা চিরদিন অক্ষুণ্ন থাকবে তার নিজস্ব ঐতিহ্যকে লালন-পালনের মধ্য দিয়ে। বাঙালি তার সহস্রাধিক বছরের গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য চেতনায় সদা উন্মুখ হয়ে উঠবে।

পরিশিষ্ট- ১

চিত্র পরিচিতি

চিত্রক্রম :	চিত্রের ব্যবহার/ পরিবেশনারীতি	চিত্রের উৎস/ তথ্যসূত্র
মানচিত্র- ১ :	বৃহত্তর উত্তরবঙ্গের মানচিত্র	নাজমুল হক, উত্তরবঙ্গের লোকসাহিত্যের নৃতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক সমীক্ষা
মানচিত্র- ২ :	পঞ্চগড় জেলার মানচিত্র	শামসুজ্জামান খান (গ্রন্থমালা সম্পাদক), বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা-পঞ্চগড়
আলোকচিত্র-১	পঞ্চগড় জেলার নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী	নাজমুল হক, প্রাগুক্ত
আলোকচিত্র-২	পঞ্চগড় জেলার নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী	নাজমুল হক, প্রাগুক্ত
আলোকচিত্র-৩	পঞ্চগড় জেলার নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী	নাজমুল হক, প্রাগুক্ত
আলোকচিত্র-৪	পঞ্চগড় জেলার নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী	নাজমুল হক, প্রাগুক্ত
মানচিত্র- ৩	ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারার অবস্থান	সাইমন জাকারিয়া, *বাংলাদেশের লোকনাটক: বিষয় ও আঙ্গিক বৈচিত্র্য*, বাংলা একাডেমি, ২০০৮।
রেখাচিত্র- ১	প্রাচীন বাংলার বুদ্ধনাটক	সাইমন জাকারিয়া, প্রাগুক্ত
রেখাচিত্র- ২	প্রাচীন বাংলার বুদ্ধনাটক	সাইমন জাকারিয়া, প্রাগুক্ত
আলোকচিত্র-৫	কুশান গান	সাইমন জাকারিয়া, প্রাগুক্ত
আলোকচিত্র-৬	কান্দনী বিষহরির গান	গবেষকের নিজস্ব সংগ্রহ
আলোকচিত্র- ৭	মা মনসা	আবুল কালাম আজাদ লিটন

আলোকচিত্র-৮	জারি গান	সাইমন জাকারিয়া, প্রাগুক্ত
আলোকচিত্র-৯	গাজির গান	সাইমন জাকারিয়া, প্রাগুক্ত
আলোকচিত্র-১০	মাদার পীরের গান	সাইমন জাকারিয়া, প্রাগুক্ত
আলোকচিত্র-১১	কবি গান	সাইমন জাকারিয়া, প্রাগুক্ত
আলোকচিত্র-১২	গম্ভীরা	গবেষকের নিজস্ব সংগ্রহ
আলোকচিত্র-১৩	গম্ভীরা	গবেষকের নিজস্ব সংগ্রহ
আলোকচিত্র-১৪	আলকাপ গান	সাইমন জাকারিয়া, প্রাগুক্ত
আলোকচিত্র-১৫	যাত্রা	আবুল বাসার
আলোকচিত্র-১৬	যাত্রা	রফিকুল ইসলাম সরকার
আলোকচিত্র-১৭	হুলি গানের মঞ্চ বা আসর	গবেষকের নিজস্ব সংগ্রহ
আলোকচিত্র-১৮	হুলি গানের অভিনয় উপকর	গবেষকের নিজস্ব সংগ্রহ
আলোকচিত্র-১৯	হুলি গানের আসর বন্দনা	গবেষকের নিজস্ব সংগ্রহ
আলোকচিত্র-২০	হুলি গানের পরিবেশনা	গবেষকের নিজস্ব সংগ্রহ
আলোকচিত্র-২১	হুলি গানের স্থায়ী ধাম বা মঞ্চ	গবেষকের নিজস্ব সংগ্রহ
আলোকচিত্র-২২	হুলি গানে আলোকসজ্জার ব্যবহার	গবেষকের নিজস্ব সংগ্রহ
আলোকচিত্র-২৩	মূল মঞ্চের মাঝখানে বাদকদের অবস্থান	গবেষকের নিজস্ব সংগ্রহ
আলোকচিত্র-২৪	হুলি গানে দর্শকের অবস্থান	গবেষকের নিজস্ব সংগ্রহ
আলোকচিত্র-২৫	মঞ্চের উপরে ছামিয়ানার ব্যবহার	গবেষকের নিজস্ব সংগ্রহ
আলোকচিত্র-২৬	মূল মঞ্চের চারপাশে বাঁশের বেঁড়া	গবেষকের নিজস্ব সংগ্রহ
আলোকচিত্র-২৭	হুলি গানের পরিবেশনা	গবেষকের নিজস্ব সংগ্রহ

আলোকচিত্র-২৮	হুলি গানে ভাড় চরিত্র	গবেষকের নিজস্ব সংগ্রহ
আলোকচিত্র-২৯	সফিকুল ইসলাম ও গবেষক	গবেষকের নিজস্ব সংগ্রহ
আলোকচিত্র-৩০	নগেন্দ্রনাথ রায় ও গবেষক	দিগন্ত রায়
আলোকচিত্র-৩১	সরকার হায়দার ও গবেষক	গবেষকের নিজস্ব সংগ্রহ
আলোকচিত্র-৩২	বাসুদেব বাবু ও গবেষক	আবু বক্কর সিদ্দিক রনি
আলোকচিত্র-৩৩	পোহাতু বর্মন ও গবেষক	নুরনবী জিন্নাহ
আলোকচিত্র ৩৪	রাজেশ্বর বর্মন ও গবেষক	রফিকুল ইসলাম
আলোকচিত্র-৩৫	শহিদুল ইসলাম ও গবেষক	গবেষকের নিজস্ব সংগ্রহ
আলোকচিত্র-৩৬	সামন্ত রায় ও গবেষক	গবেষকের নিজস্ব সংগ্রহ
আলোকচিত্র-৩৭	প্রসন্ন কুমার রায় ও গবেষক	রফিকুল ইসলাম সরকার
আলোকচিত্র- ৩৮	জয়ন্ত রায় ও গবেষক	হীরেন রায়
আলোকচিত্র-৩৯	হরেন্দ্রনাথ রায় ও গবেষক	রফিকুল ইসলাম সরকার
আলোকচিত্র-৪০	সুনীল চন্দ্র ও গবেষক	রফিকুল ইসলাম সরকার

পরিশিষ্ট- ২

পঞ্চগড় জেলার হুলি গানের পালার কিয়দংশ ও কয়েকটি গান

পঞ্চগড় জেলার হুলি গানের রং পাঁচালি পালা 'মফিজুল ফাতেহার গান' এর মূল কাহিনী চন্দ্রা চন্দ্রদেবী ও মফিজুল ফাতেরা(বাউদিয়া) নামের দুই তরুণ-তরুণীর প্রেমকে উপজীব্য করে। দুইজন তরুন-তরুনীর প্রেম এখানে ধর্মীয় সংঘাত কে উপেক্ষা করে এক অনবদ্য চিত্র ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়। নিম্নে জনপ্রিয় পরিবেশনার কিয়দংশ তুলে ধরা হলো-

পিঠারু :

উঠরে শালী, চলরে শালী (স্ত্রী কে)
চল যাই হাটিয়া,
হাটের বেলাটা শালী
যাছে রে চলিয়া।
হামরা যাছি বটের হাট
হামার হবে রাত,
ভুস (মুহিষ) গরুলা ঢুকায় বেটি
জগতে (তাড়াতাড়ি) গে রান্ধিস ভাত।

পিঠারু : বড়াই দুঃখের ওহে সংরা (বেহাই) আসিনু তোমার বাড়িত।

কালু : হই সংগড়া ! তুমার আরহ্ কিসের দুঃখ হে, তুমার ভাতের দুঃখ না শাকের দুঃখ হে।

পিঠারু : মোর দুঃখের কাথা লা সংগ্রা তুমরা শুনেন নি...

কালু : কেনেহে সংরা এতোই তুমহার চিন্তা?

পিঠারু : কপালত নাই বেটা ছাওয়া, বেটি তিনজনা,

ভালোয় দেখে একটা চাকর দেওনা মিলাইয়া।

তুমহার সুংরি (বেহাইন) ভুস-গরুলা দেখিবা, লে (নিয়ে) বেড়াবা পারে না।

কালু : ওইলার বিষে-বিষে ওহে সংরা চিন্তা করিবেন না।

হামার বেটা মফিজুল'ক দিম হে রাখিয়া।

আচ্ছা সংরা, বেতন কেতলা দিবেন হে?

পিঠারু : ওনা আটশ টাকা দরমা দিমো।

শুন হে সংরা, হাফ জামা, একখান লুঙ্গি দিম কিনিয়া।

কালু : আচ্ছা যাও সংরা, কাইল সকালে হামার ব্যাটাকে দিমো পাঠেয়া।

কালু : ও বেটা তুমহার দোসবাপ (বন্ধুর বাবা) আসিছিল তোক নেগাবা, ওমহার ভুস-গরুলা লেবেড়াবার নাই লোক তার তানে।

মফিজুল : বাপের বেটা একটা হইয়া নাই গে করু কাম, চাকুরী খাটিয়া বাবা কেমন করে যায়।

কালু :

এইনা বছর ওরে ব্যাটা খাটেক চাকুরী,
আর বছর না জুড়িম কইনা দেখিয়া সুন্দরী ৷৷

মফিজুল : বাবা, মুই যাছু গে!

কালু : যা বেটা।

মফিজুল : বারোঘোরিয়া বাড়িরে মোর কালুর বেটা, বাপে-মায়ে নাম রেখিছে মফিজুল গে ফাতেরা। কপালত আছে যা কায় আর খণ্ডাবে, চাকুরী খাটিবা যাছুরে মুই গোয়ালতলি। দশমা গে দশমা! (কাকিমা)

দশমা : কায়রে বা!

মফিজুল : মইহে দশমা, আসিনু গে চাকুরী খাটিবা, কি আছে কাম-কাজ দেনা গে বাতাইয়া!

দশমা : ভুস-গরুলা ওরে ব্যাটা থানত (উঠানের নির্দিষ্ট স্থানে) বান্ধে দে। জমি দেখায় দিবা যাবে ঐ চন্দ্রদেবী।

চন্দ্রদেবীঃ

ওনা হাল জঙ্গাল ওরে বিদেশিয়া,
ঘাড়ে তুলিয়া লে,
জমি দেখায় দিবা যাছু মুই চন্দ্রদেবী।
ওনা খাপ না ফারে দুই চাষ ধরিস
মুই যাছু বাড়ি-
তোর তানে ধরে আনিম তামাক আর বিড়ি ॥

মফিজুল :

যারে যারে মাতার গরু-
তুই রে হাল খানা যা,
জলপান ধরে অসেচে চন্দ্রদেবীটা ॥

চন্দ্রদেবী :

ও না মাথায় লিছু হাতে লিছু (নিয়েছি) নলকুপের পানি,
জলপান ধরে যাছু মুই মফিজুলের হাল বাড়ি।
চৈত্র মাসের রোদরে দাদা গেইছি ঘামিয়া,
শাড়ি কান্দে হুকায় দেছু ছায়াত বসে খা ॥

মফিজুল : এইলা আরহ্ কি গে?

চন্দ্রদেবী :

চুড়া দিছু, মুড়ি দিছু, আরহ্ দিছু ঘি,
তলতে দিছু দুধের মাখন সানিয়ারে (মেখে) খা কেনি ॥

মফিজুল : মাখন খান তলত কেনে দিছিগে?

চন্দ্রদেবী : বাবার ভয়ে।

মফিজুল : কি! বাঘের ভয়ে?

চন্দ্রদেবী :

কথায় (কোথায়) তমার (তোমার) ঘররে বিদেশিয়া
কথায় তমার বাড়ি,
কি তোমার নাম রে বিদেশিয়া
খুলিয়া কহ কেনি ॥

মফিজুল :

বারঘোরিয়া বাড়িরে মোর কালুর ব্যাটা,

মা-বাপে নাম রাখিছে মফিজুল গে ফাতেরা। তোর নাম কি গে সই?

চন্দ্রদেবী :

গোয়ালতোলি বাড়িরে মোর পিঠারুর বেটি,
বাপ মায়ের নাম রাখিছে ওই চন্দ্র গে দেবী ॥

চন্দ্রদেবী : মাগে মুই ছাগল ছাবিবা (খুঁজতে) যাছু।

মা : কেনে বেটি ছাগলটা কি নাই ?

চন্দ্রদেবী : যাছু মা।

ছাগল ছাবিবা যেমন তেমন মনডাকে বুঝাম,

মফিজুল দাদার লাগাল পাইলে গলাতে ঝুলাম।

মফিজুল : দশমা, কি তরকারি গে দশমা?

দশমা :

মুশুরী কালাইর ডাইল রে বেটা,
পটোলের ভাজি,
হামার তানে রানছুরে বেটা -
দুরা (কাছিম) মাছের তরকারী ॥

(উৎস: শামসুজ্জামান খান, বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা পঞ্চগড়, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১৩, পৃষ্ঠা. ২৫৮-২৬০)

পঞ্চগড় জেলার হুলির পরিবেশনায় ব্যবহৃত কয়েকটি গান :

(১)

আজি আর কতদিন, নাকফরে যৌবন,
হায় হায় বুকের শাড়ী বাদে
ভিজে যায় মোর ইতি নগর
হায় রে, হায় রে বিধি।।
আজি ফোটা ফুলের মধু রে,
ওরে মোর রে,
কে খাইবে নাই ভোমোরা রে,
মধু যাবে রে অধোগতি।।
আকাশ হতে চন্দ্র রে ...
ওরে হাসে,
লক্ষ তারা তার পাশে (পিছনে)-
যেমন জ্বলেছে বিজরী ॥

(উৎসঃ পোহাতু বর্মন, সময়ঃ সকাল ১১:৩০, ৩ সেপ্টেম্বর ২০২১, লাখেরাজ ঘুমটি, মাগুরা, পঞ্চগড়)

(২)

বন্ধুরে, ও তুই দেখা দে আসে,
ওরে অভাগিনী নারীডার স্বামী আইসাছে।
বন্ধু...
বুক ফাটেছে পশ্চিয়ারে বায় (বাতাসে)
ফম (স্মরণ) পড়েছে সদায় রে সদায়।
ওরে জ্বলেছে মোর প্রেমের আগুন-
নিভাবে রে আর কায় (কে) ॥

(উৎসঃ পোহাতু বর্মন, সময়ঃ সকাল ১১:৪০, ৩ সেপ্টেম্বর ২০২১, লাখেরাজ ঘুমটি, মাগুরা, পঞ্চগড়)

(৩)

ও ভাই দস্যু রে.......
কি বা দোষ পাইয়া মোরে,
ওনা বিনা দোষে জীবন নিবেন
ও ভাই দস্যু রে।
দস্যু, হাতে ধরু, পায়ে পড়ু,
ক্ষমা করো দস্যু তোমায় বলি,
ওরে, এই বিপদে কেউ নাই-
তোমরা দুই বিহনে ॥

(উৎসঃ দয়াল বর্মন, সময়ঃ দুপুর ১২:৩৬, ৩ সেপ্টেম্বর ২০২১, লাখেরাজ ঘুমটি, মাগুরা, পঞ্চগড়)

(৪)

ওগে দাদা গে, ওগে দাদা......
আজি মোর দেনাটার নাই গে দাদা-
ওই না বেশ কইনা।
দাদা, যেইলা গে দাদা গে,
মোর থেকে ছোট,
ঐলার দাদা গে হইছে গে বিহা।
ঐনা তার ছুয়ালা ,
ডাকাছে গে মোক ঠোকরিয়া ॥

(উৎসঃ দয়াল বর্মন, সময়ঃ দুপুর ১২:৩৬, ৩ সেপ্টেম্বর ২০২১, লাখেরাজ ঘুমটি, মাগুরা, পঞ্চগড়)

(৫)

(পঞ্চগড় জেলার হুলির গানের বন্দনা)

এইবার বন্দনা করেছি রে শান্তি-সমাচার,
ওই বুদ্ধিমান হইলো সরকার।
ওরে, রাস্তায় রাস্তায় গাছ লাগাইছে
মেয়ে মানুষে দ্যাছে পহড়া।

ওকি ও ভাইরে-
ওই যে কিষক নোকের কপাল ভালো,
চায়না-বুরো আবাদ করো,
ওরে চায়না-বুরো আবাদ করে-
দেশের অভাব দূর করে।

ও এইবার, বন্দনা করেছি রে শান্তি সমাচার-
ওই বুর্দ্ধিমান হইলো সরকার,
ওরে, রাস্তায় রাস্তায় গাছ নাগাইছে,
মেয়ে মানুষে দ্যাছে পহড়া।

ওকি ও ভাইরে-
ওই যে গরিব নোকের খাবার হাটত্
টাকা পাইসা নাইরে নগত।
ওরে, কামের উপর টাকা নিয়া
খরচ করছে সবার পাছত ॥

(উৎসঃ পোহাতু বর্মণ হতে প্রাপ্ত, সময়- রাত ১১টা, তারিখ ৫-৯-২০২১, লাখেরাজ ঘুমটি মন্দির মাঠ, মাগুরা, পঞ্চগড়)

(৬)

(বেঙ্গন পহড়া পালায় শাশুড়ির গান)

ছিঃ রে, ছিঃ রে
জুয়াই বেটা
নইজ্যা নাইরে তোর,
মইনসির আগত্ উপকলঙ-
তুই উঠালো মোর।
জুয়াই এত কইলেন তাই-বাই,
ধর্ম-কর্ম তুমহার কিছুই নাই,
জুয়াই হয়া নাড়িয়া ফেলালেন
মোর গাও ॥

(উৎসঃ পোহাতু বর্মণ হতে প্রাপ্ত, সময়- রাত ১২:৫০টা, তারিখ ৬-৯-২০২১, লাখেরাজ ঘুমটি মন্দির মাঠ, মাগুরা, পঞ্চগড়)

(৭)

(বেঙ্গন পহড়া পালায় জামাইয়ের গান)

আজি পাও ধরিয়া কহছু গে নেহরা,
মোর শশুড়ের বাড়ি মিয়াভিটা,
মোর শশুড়ের নাম ধনসুরা বুড়া,
মোর নামডা হছে নেঠালাগা ॥

(উৎসঃ সুবাস, হীরেন, পোহাতু বর্মণ প্রমুখ সম্মিলিত কণ্ঠে, সময়- রাত ১২:৫০টা, তারিখ ৬-৯-২০২১, লাখেরাজ ঘুমটি মন্দির মাঠ, মাগুরা, পঞ্চগড়)

(৮)

(বেঙ্গন পহড়া পালায় অভাগিনী নারীর গান)

আজি ফুলের যেমন ভমর-
আছে রে দাদা,
নায়ের আছে মাঝি।
মুই নারীডা অভাগিনী রে,
সঙ্গে নাই মোর সাথী।

আজি গাছের সবাং লতা-পাতা রে ও দাদা,
বাড়ির সবং নারীকেল গুয়া,
নারীর সবাং শাখা-সিন্দুঁরে-
মায়ের সবাং কলার ছাওয়া।

আজি মুই অ দুফুল বাগিচা
মোকুন্না রে মোকুন্না,
তুই মোর ভমরা,
ফুটা ফুলের মধু খা তুই রে,
ও তুই ডালতে বসিয়া-
ও তুই ফুলতে বসিয়া ॥

(উৎসঃ পোহাতু বর্মণ, সময়- রাত ১২:৫০টা, তারিখ ৬-৯-২০২১, লাখেরাজ ঘুমটি মন্দির মাঠ, মাগুরা, পঞ্চগড়)

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

১. অতুল সুর, *ভারতের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়*, কলকাতা, ১৯৮৮।

২. আবুল আহসান চৌধুরী, *লোকসংস্কৃতি- বিবেচনা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৭

৩. আবদুল ওয়াহাব, *বাংলাদেশের লোকগীতি*, একটি সমাজতাত্ত্বিক অধ্যায় (২য় ও ৩য় খন্ড), বাংলা একাডেমি, প্রথম প্রকাশ ২০০৮।

৪. আলমগীর জলিল, *বাংলাদেশের গ্রামীণ সংস্কৃতি*, ব্র্যাক প্রকাশনা, ঢাকা, ১৯৮৫।

৫. ইসরাফিল শাহীন (সম্পা.), *পরিবেশন শিল্পকলা (জারিগান:সাইম রানা)*, খন্ড ১২, এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ৭১।

৬. এম এ মজিদ, *যাত্রার ইতিবৃত্ত*, কারুবাক, ঢাকা, ২০২০।

৭. ওয়াকিল আহমদ, *বাংলা লোকসাহিত্য: মন্ত্র*, এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ১৯৯৫।

৮. জীবিতেশ বিশ্বাস, *সহজানন্দে চর্যাপদ*, ইন্তামিন প্রকাশন, ঢাকা, ২০২১, পৃ. ৬৬

৯. তপন বাগচী, *বাংলাদেশের যাত্রাগান: জনমাধ্যম ও সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৭।

১০. ------, *লোকসংস্কৃতির কতিপয় পাঠ*, গতিধারা, ঢাকা, ২০০৮।

১১. তাপসকুমার বন্দোপাধ্যায়, *পাঁচালিকার ও বোলান গানের ইতিবৃত্ত*, প্রতিভাস, কলকাতা, পৃ. ২১

১২. নাজমুল হক, *উত্তরবঙ্গের লোকসাহিত্যের নৃতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক সমীক্ষা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৭।

১৩. ------, *পঞ্চগড় জেলার ইতিহাস ও লোকসংস্কৃতি*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৯।

১৪. ------, পঞ্চগড় : ইতিহাস ও লোকঐতিহ্য, গতিধারা, ঢাকা, ২০০৯।

১৫. নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস* (আদিপর্ব), দে'জ, কলকাতা, ১৩৮২

১৬. মযহারুল ইসলাম (সম্পা.), *ফোকলোর*, (চতুর্থ বর্ষ, ২য় সংখ্যা), ঢাকা, ২০০১।

১৭. মাযহারুল ইসলাম তরু, *চাঁপাইনবাবগঞ্জের লোকসংস্কৃতির পরিচিতি*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৯।

Dhaka University Institutional Repository

১৮. ------, *বরেন্দ্র অঞ্চলের লোকসংগীত*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০২।

১৯. মুহম্মদ আবদুল জলিল, *বাংলাদেশের ফোকলোর চর্চার ইতিবৃত্ত*, অনার্য, ঢাকা, ২০১১।

২০. মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা (সম্পা.), *চর্যাগীতিকা*, ষষ্ঠ সংস্করণ, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা, ১৪১৪ বঙ্গাব্দ।

২১. মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, *দিনাজপুরের লোকনাট্য : হোলির গান*, কলি প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১১।

২২. রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, (প্রথম খণ্ড), কলকাতা, ১৯৭৪।

২৩. শামসুজ্জামান খান (সম্পা.), *বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা: পঞ্চগড়*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১৩।

২৪. সাইমন জাকারিয়া, *বাংলাদেশের লোকনাটক: বিষয় ও আঙ্গিক বৈচিত্র্য*, বাংলা একাডেমি, ২০০৮।

২৫. ------, *প্রাচীন বাংলার বুদ্ধনাটক*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০২০।

২৬. সাইম রানা, *সংগীতের প্রয়োগ ও সীমা*, সংহতি প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৮।

২৭. সামীয়ূল ইসলাম, *বাংলাদেশের গ্রামীণ খেলাধূলা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯২।

২৮. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, *বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা*, রূপা, কলকাতা, ১৯৯১।

২৯. সুমনকুমার দাশ, *বাংলাদেশের ধামাইল গান*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১০।

৩০. সেলিম আল দীন, *মধ্যযুগের বাঙলা নাট্য*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১৮।

৩১. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *গ্রামীণ চারু ও কারুকলা*, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা ১৯৯৩।

৩২. G.A. Grierson, *Linguistic Survey of India*, Vol-111, Part 2, Page. 95

৩৩. Muhammad Shahidullah, *Buddhist Mystic Songs*, Bengali Academy, Revised and Enlarged Eddition, Dhaka, 1966, p. 53

৩৪. Syed Jamil Ahmed, *Acin Pakhi Infinity: Indigenous Theatre of Bangladesh*, The University Press Limited, 2000, p. 290